পর্যটনের নতুন দিগন্তে পদ্মা সেতু

পদ্মা সেতুতে রেল চলাচল শুরু হওয়ায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগের নবদিগন্ত উন্মোচিত হলো এবং বর্ণিল সাজে সজ্জিত হয়েছে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে এলাকা। পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিক ট্রেন চলাচল করছে। পর্যটন সম্ভাবনার বৃহৎ উৎসস্থল হলো পদ্মা সেতু।

স্বপ্নের পদ্মা সেতু বাংলার মানুষের বহুল প্রতীক্ষিত স্বপ্ন পূরণের অনন্য উদাহরণ। পদ্মা সেতুর মাধ্যমে মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ের সাথে শরীয়তপুর জেলার জাজিরাসহ দক্ষিণাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য জেলার সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক যোগসূত্র স্থাপন হবে।

এই যোগসূত্র স্থাপনের ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিল্প বিকাশের অনন্য অবদান রাখবে। পদ্মা সেতু দেশের পরিবহন নেটওয়ার্ক এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে পদ্মা সেতুর দুই পাড় পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক পদ্মার দুই পাড়ে নান্দনিক সৌন্দর্য দেখার জন্য ঘুরতে যায়। মাওয়া ও শরীয়তপুর প্রান্তে রেস্টুরেন্ট, রিসোর্ট, হোটেল-মোটেলসহ পর্যটন সংশ্লিষ্ট নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে তিনটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রয়েছে তন্মধ্যে ষাট গম্বুজ মসজিদ ও ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন এই দুইটি হেরিটেজ দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত তবে অতীতে ওই অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক পর্যটকদের পছন্দের পর্যটন কেন্দ্র হওয়া স্বত্বেও ভ্রমণে আগ্রহ ছিল কম। পদ্মা সেতুর ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের পর্যটন আকর্ষণগুলোতে ভ্রমণে আগ্রহ বাড়বে।

পদ্মা সেতু দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার সাথে সংযোগ স্থাপন করবে। এই অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত স্বপ্নের পদ্মা সেতু এখন বাস্তব। ঢাকার সাথে মংলা বন্দর, বরিশাল, কুয়াকাটা, পায়রা বন্দর, খুলনা, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর,

মাদারীপুরসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য জেলার অর্থনৈতিক খাতে এক নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে।

এই পদ্মা সেতুর ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ৩ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে। দেশের অর্থনীতিতে পদ্মা সেতুর ভূমিকা নিয়ে এর আগে বিশ্বব্যাংক বলেছিল, সেতু বাস্তবায়িত হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১ দশমিক ২ শতাংশ বেড়ে যাবে। আর প্রতি বছর দারিদ্র্য নিরসন হবে শূন্য দশমিক ৮৪ ভাগ।

দক্ষিণাঞ্চলের পর্যটন আকর্ষণগুলোর মধ্যে ভাসমান পেয়ারা বাজার, ঐতিহাসিক দুর্গা সাগর, কবি কৃষ্ণচন্দ্র ইন্সটিটিউট, খান জাহান আলী সেতু, খুলনা বিভাগীয় জাদুঘর, জাতিসংঘ পার্ক, দক্ষিণডিহি রবীন্দ্র কমপ্লেক্স, বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের মাজার, রূপসা নদী, শহীদ হাদিস পার্ক, খানজাহান আলী কর্তৃক খননকৃত বড়দীঘি, খুলনা শিপইয়ার্ড, গল্লামারী স্মৃতিসৌধ ও বধ্যভূমি, জাহানাবাদ বনবিলাস চিড়িয়াখানা ও শিশুপার্ক, পিঠাভোগ, প্রেম কানন বকুলতলা, মংলা পোর্ট, রাড়ুলী, রেলস্টেশনের কাছে মিস্টার চার্লির কুঠিবাড়ি, সোনাডাঙ্গা সোলার পার্ক ও অন্যান্য পর্যটন আকর্ষণগুলোর চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে।

পর্যটকেরা কুয়াকাটা সমুদ্রের নান্দনিক সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং খুব কম সময়ে সুন্দরবনের অন্যতম আকর্ষণীয় স্পট-কচিখালী, কটকা সৈকত, জামতলা সী-বিচ, সুন্দরবন সংলগ্ন সাগরে জেগে ওঠা দ্বীপ পক্ষীর চর, ডিমের চর ঘুরে দেখার অপার সুযোগ সম্প্রসারিত হবে। কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত, সুন্দরবন, পায়রা বন্দরকে ঘিরে পর্যটন সম্ভাবনার নতুন দ্বার খুলবে পদ্মা সেতু এবং মাত্র ৬ ঘণ্টায় উপরের উল্লেখিত পর্যটন আকর্ষণগুলোতে পর্যটকেরা যেতে পারবে।

অন্যদিকে কুয়াকাটার গা ঘেঁষে অবস্থিত ফাতরার চর, লাল কাকড়ার চর, শুঁটকি পল্লী, লালদিয়ার চর, চর বিজয়, ফকিরহাট, সোনার চর, ক্র্যাব আইল্যান্ড বা কম কী? একটি স্পট থেকে আরেকটি স্পট নান্দনিক এছাড়াও রয়েছে ভিন্ন রকম জীব-বৈচিত্র্যর সমারোহ। দারুণ সময় কাটাতে চাইলে এসব পর্যটন স্পটের জুড়ি পাওয়া কঠিন। রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা স্বল্প সময়ে পণ্য পরিবহন করে মংলা বন্দরের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি গতিশীল হবে এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি হবে। কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত (যেখানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত অবলোকন করা যায়), ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন সংলগ্ন

ছোট ছোট দ্বীপগুলোকে মালদ্বীপের ন্যায় পর্যটন আকর্ষণ তৈরি করা সম্ভব এবং সুন্দরবন ঘিরে ওয়াইল্ড লাইফ ট্যুরিজম উন্নয়নের অনন্য সুযোগ রয়েছে।

প্রতিবছর পর্যটকবাহী ৪৫টি ক্রুজ ভারতে কুচবিহার-চেন্নাই-গোয়া হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ শ্রীলঙ্কা ও মিয়ানমারে চলে যায়। তবে এই ক্রুজগুলো যদি পায়রা বন্দরে আকৃষ্ট করা যায় তবে আন্তর্জাতিক পর্যটক উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে। পদ্মা সেতু গতিশীল করবে মংলা ও পায়রা বন্দরকে যা সুনীল অর্থনীতিতে অনন্য অবদান রাখবে। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল যেমন কুয়াকাটা, মংলা বন্দর ও পায়রা বন্দর কেন্দ্র করে সমুদ্র পর্যটনের সম্ভাবনার নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। নদীভিত্তিক ও সমুদ্রভিত্তিক পর্যটনে সময়োপযোগী সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রা বাস্তবায়নের পাশাপাশি তৈরি করবে কর্মসংস্থান সুযোগ, শক্তিশালী হবে জাতীয় অর্থনীতি। তবে আন্তর্জাতিক পর্যটক আকর্ষণের জন্য পদ্মা সেতুর ও দক্ষিণাঞ্চলের পর্যটন আকর্ষণগুলো ছোট ছোট প্রমো তৈরি করে ডিজিটাল ব্র্যান্ডিং করা প্রয়োজন।

লেখক: চেয়ারম্যান, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে শেখ হাসিনা সরকারের অবদান

বাংলাদেশ আমাদের কাছে মাতৃস্বরূপ। বরাবরই এদেশের স্তন্যদায়ী গ্রামীণ প্রকৃতির আলো-বাতাস-জল এসবের লালিত্যে বাঙালির দৈহিক ও মানসিক পুষ্টি সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে গ্রাম বাংলা আমাদের জীবনে নিউক্লিয়াসের সমতুল্য। বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রকৃতি ও পরিবেশ একদিকে যেমন অপরূপ সৌন্দর্যের উৎস, তেমনি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের অন্যতম সরবরাহকারী ক্ষেত্র। আজ শহরায়নের ফলে মানুষ অনেকবেশি শহরমুখী। জীবন ও জীবিকার তাগিদে সকলে শহরপানে ছুটে চলেছে। তাই শহরের ওপর চাপ বৃদ্ধির পাশাপাশি

গ্রামীণ অর্থনীতি কিছুটা পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছিল।

কিন্তু শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশে আজ টেকসই গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জোয়ার বইছে। বাংলাদেশে মূলত গ্রামীণ অর্থনীতির সম্প্রসারণের ফলেই দেশে আজ উন্নতির সুবাতাস বইছে। বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে গ্রাম অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থা ও অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন; গ্রামে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় আধুনিক উপকরণের সহজলভ্যতা; শিক্ষা, চিকিৎসা ও বৈদ্যুতিক খাতে অভাবনীয় উন্নতি সাধন; পাশাপাশি উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি গ্রামে সরবরাহের মাধ্যমে বিশ্বের সাথে গ্রাম বাংলার জনজীবনের সংযুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের নিরলস পরিশ্রমের ফলে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশে আজ উন্নতির নৌকা নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে অবিরাম ছুটে চলেছে। পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু টানেলের মতো মেগাপ্রকল্প শেখ হাসিনা সরকারের হাত ধরে জাতির পিতার সোনার বাংলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলে, শেখ হাসিনা সরকারের নেতৃত্বের সুনাম বর্তমানে জাতীয় পর্যায়কে জয় করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। বাংলাদেশে শহর অঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামীণ বা তৃণমূলে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশের গ্রাম এলাকায় পর্যাপ্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের পাশাপাশি গ্রামের কাঁচা-মেঠোপথ পাকাকরণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে শেখ হাসিনার সরকার।

বর্তমানে বাংলাদেশে শহর কিংবা গ্রাম উভয় পরিবেশে জীবনযাত্রার মান প্রায় সমান। শেখ হাসিনার সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলার গ্রামও আজ শহরের মতো আধুনিকতার স্পর্শতায় পরিপূর্ণ। শেখ হাসিনা সরকার বরাবরই গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করেছে। দেশের উন্নয়নের অভিযাত্রায় ‘আমার গ্রাম আমার শহর’ সংযোজনটি গ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিকে ব্যাপক শক্তিশালী ভিত দান করেছে। আর বর্তমানে বাংলাদেশের জনগণের উন্নত জীবনযাপন ও দেশের শক্তিশালী জাতীয় অর্থনীতি বিনির্মাণের একমাত্র দাবিদার শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার নিঃসন্দেহে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যা করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির পথকে রুদ্ধ করে দিতে চেয়েছিলো প্রেতাত্মারা।

কিন্তু শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্ব ও আওয়ামী লীগ সরকার জনগণকে আজ সেই কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদ প্রদান করেছে। বৈশ্বিক ও জাতীয় সকল চক্রান্তকে ব্যর্থ করে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। শেখ হাসিনা সরকারের অন্যতম মূলমন্ত্র হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক মনোভাব। ফলে বর্তমানে দেশে উন্নয়নের সুফল সকলে পাচ্ছে এবং আয়ের বৈষম্য কমে মানুষের পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে।

সময়ের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে শেখ হাসিনার সরকার গ্রাম অঞ্চলে উন্নত রাস্তাঘাট, সুপেয় পানি, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ও সুচিকিৎসা, মানসম্মত শিক্ষা, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সরবরাহ, গ্রামে গৃহহীনদের জন্য সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্প, কম্পিউটার ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানের মতো কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রাম অঞ্চলে আধুনিক জীবনযাপনের সকল উপকরণ নিশ্চিত করেছে। এছাড়াও কৃষিযন্ত্র সেবাকেন্দ্র ও যান্ত্রিকায়ন সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রামে পর্যাপ্ত কর্মস্থাপনের ব্যবস্থা করে শেখ হাসিনার সরকার জাতীয় অর্থনীতির চাকাকে বেগবান করে তুলেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের সঠিক নেতৃত্বে আজকে প্রতিটি গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা কিংবা জেলা একসূত্রে যুক্ত।

গ্রাম ও শহর উভয়ের ব্যাপক উন্নয়ন ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে সমবায় পন্থায় সৃষ্ট বাংলাদেশের সমৃদ্ধ জাতীয় অর্থনীতি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সফলতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নকে সমুন্নত রাখতে এবং এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে আসন্ন আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বের বিকল্প নাই। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও জাতির পিতার মুজিবীয় আদর্শে বিশ্বাসী বাংলাদেশের আপামর জনগণ আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বকে পুনরায় বিজয়ী করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সমুন্নত রাখবে নিঃসন্দেহে।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়।

আমার বাড়ি আমার খামার: দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দিন বদলের হাতিয়ার

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা, সুষম পুষ্টি, বেকার সমস্যার সমাধান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কৃষি জমির উর্বরতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নত মেধা সম্পন্ন জাতি গঠনে কৃষি খামারের ভূমিকা অপরিসীম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ৭, ৯, ১০, ১৪, ১৫ এবং ১৬ অনুযায়ী প্রতিটি পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করতে বলা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর সূচিত পথ ধরে তারই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ক্ষমতায় এসে দরিদ্র মানুষের জন্য ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ প্রকল্পের একটি ধারণা তৎকালীন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মো. রহমত আলীকে প্রদান করেন।

প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন তখন দেশের সমৃদ্ধ ইকোসিস্টেমকে ব্যবহার করে প্রতিটি গ্রামের বাড়িতে কৃষি, মৎস্য চাষ, পশুপালন ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে কার্যকর খামারবাড়ি হিসেবে গড়ে তোলা। এই ধারণার কার্যকারিতা পরীক্ষা করার লক্ষ্যে প্রথমে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলায় একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প পরিচালনা করে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রীর ধারণাটি পরিবার পর্যায়ের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা আয় সঞ্চারণে বেশ কার্যকর।
এই প্রেক্ষাপটে একনেক কর্তৃক জুলাই ২০০০ সাল থেকে জুন ২০০৫ মেয়াদের জন্য ১৪১০৮.০২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় এবং এর বাস্তবায়ন শুরু হয়। কিন্তু ২০০১ সালের নির্বাচনে সরকার পরিবর্তন হলে তৎকালীন সরকার প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়।

২০০৯ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পুনরায় সরকার গঠন করলে আমার বাড়ি আমার খামার নামে প্রকল্পটি আবার কার্যক্রম শুরু করে। ২০০৯ সাল থেকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠনের ফলে প্রকল্পের মেয়াদ সর্বশেষ ২০২১ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পল্লী এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র মানুষদের সংগঠিত করে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি ও স্থায়ী ঘূর্ণায়মান তহবিল গঠন করা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং গঠিত তহবিল পারিবারিক বলয়ে আয়বর্ধক কৃষিজ খামার স্থাপনে বিনিয়োগ করা এবং জীবিকা উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের আওতায় একেকটি গ্রাম থেকে ৬০টি দরিদ্র পরিবার নির্বাচন করে ৪০ জন নারী এবং ২০ জন পুরুষ নিয়ে একটি সমিতি গঠন করা হয়। এই সমিতির সদস্যরা মাসে ২০০ টাকা হারে সঞ্চয় করেন। সদস্যদের সঞ্চয় জমা একনাগাড়ে ২৪ মাস পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়। ৬০ জন সদস্য ২৪ মাসে ২০০ টাকা হারে সঞ্চয় করলে দুই বছরে ২.৮৮ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা হয়।

সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রকল্প থেকে সমপরিমাণ অর্থ (সদস্য প্রতি মাসে ২০০ টাকা হারে ২৪ মাস) উৎসাহ সঞ্চয় বা বোনাস হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়। এটি দরিদ্র সদস্যদের তাদের কষ্টার্জিত দৈনন্দিন আয় থেকে সঞ্চয় করতে অনুপ্রাণিত করে।

এছাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতির নিজস্ব স্থায়ী তহবিল গঠনের জন্য প্রকল্প থেকে প্রতি সমিতিতে বছরে ১.৫০ লক্ষ টাকা করে দুই বছরে ৩ লাখ টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়। সদস্যদের নিজেদের সঞ্চয় ও প্রকল্প থেকে সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রদত্ত উৎসাহ সঞ্চয় বা কল্যাণ অনুদানের সাথে ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে অনুদান যোগ হয়ে প্রতি সমিতির জন্য দুই বছরে ৯ লাখ টাকার একটি স্থায়ী তহবিল গড়ে ওঠে।

এই অর্থের মালিক সমিতি। সমিতির সদস্যরা এই অর্থ স্থায়ীভাবে আয়বর্ধক খামার করতে ব্যবহার করে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় সমিতির সদস্যদের দক্ষ খামারি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০২১ মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষুদ্র সঞ্চয় দর্শন অনুসরণে বাস্তবায়িত ‘আমার বাড়ি আমার খামার’ প্রকল্পের অধীনে মোট গ্রাম সমিতি গঠিত হয়েছে ১,২০,৩২৫টি। দরিদ্র সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের পরিমাণ ২০৮৬ কোটি টাকা। গ্রাম সমিতির জন্য মোট তহবিল গঠিত হয়েছে ৭৬০৯ কোটি টাকা। সদস্যদের বাড়িতে পারিবারিক খামার স্থাপিত হয়েছে ৩৩ লক্ষ ৩৭ হাজার।

এটি এখন স্বীকৃত যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষুদ্র সঞ্চয়

দর্শন ‘আমার বাড়ি আমার খামার’ প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে একদিকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য যেমন বিপুল পরিমাণ তহবিল স্থায়ীভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে তেমনি অপরদিকে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

২০১০ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত দরিদ্রতার হার প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে এবং অতি দরিদ্রতার হার হ্রাস পেয়ে এক তৃতীয়াংশে নেমে এসেছে। বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত হয়েছে। যারা পূর্বে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবা বহির্ভূত ছিল, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক এইসব পরিবারদের ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করেছে, যা বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখছে।

ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিকল্প ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের ‘আমার বাড়ি আমার খামার’ হয়ে উঠেছে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দিন বদলের হাতিয়ার।

লেখক: সার্জারি এন্ড থেরিওজেনোলজি বিভাগ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

সংলাপ নয় সংঘাতেই বিএনপির ভরসা

রাজনীতির মাঠে সংলাপ শব্দটি আবারও ঘুরতে শুরু করেছে। বহুল আলোচিত ২৮ অক্টোবরের পর এবার শর্তহীন সংলাপের বিষয়টি সামনে এনেছেন আরেক আলোচিত কূটনীতিক মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস। গত ২৮ অক্টোবর বিএনপির সহিংসতার পর মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস হরতাল অবরোধের মধ্যেই নির্বাচন কমিশন ভবনে গিয়ে সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়ালের সাথে বৈঠক করলেন। যদিও বৈঠকটি পূর্ব নির্ধারিত ছিলো না। সিইসির সঙ্গে বৈঠক সেরে বেরিয়ে এসে নিজেই সাংবাদিকদের সামনে এসে কথা বললেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পুরোনো কথাগুলো বললেন। শেষ দিকে এসে বললেন গণতান্ত্রিক নির্বাচনে কোনো পক্ষের রাজনৈতিক সহিংসতার কোনো স্থান নেই। তার আশা সব পক্ষ শর্তহীনভাবে সংলাপে বসে সামনের দিকে এগোবে। পিটার হাসের সাথে সুর মিলিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতরাও শর্তহীন সংলাপের

বিষয়টি আলোচনায় এনেছেন। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতও সরকারের মন্ত্রীদের সাথে দেখা করে শর্তহীন সংলাপের প্রসঙ্গটি তুলেছেন।

এতো গেলো মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও তাদের সঙ্গী সাথীদের কথা। এখন প্রশ্ন হলো বিএনপি কি সংলাপে বিশ্বাসী? এ প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা না এরকম এককথায় না দিয়ে একটু বিশ্লেষণে আসা যাক। দলটি কখনোই যে কোনো সংলাপ করেনি তা কিন্তু নয়। তারা যে সংলাপগুলো করেছে তা সফল হয়নি কারণ তারা সব সময়ই শর্ত জুড়ে দিয়েই আলোচনার টেবিলে যেতে চায়। আমরা ২০০৬ সালে আব্দুল জলিল ও মান্নান ভূঁইয়ার সেই সংলাপের কথা কিন্তু আমরা ভুলে যায়নি। সংলাপটি কেনো ভেস্তে গিয়েছিলো তা কিন্তু পরে আমরা পরিস্কার হয়েছি। দুই নেতাই সে সময় প্রায় একটা সমাধানে চলে এসেছিলেন কিন্তু খালেদা জিয়ার গ্রিন সিগন্যাল না থাকায় সেসময় দুজনের সংলাপটি ভেস্তে যায়। তার পরের রাজনীতির চিত্র আমরা দেখেছি।

২০১৪ সালে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা খালেদা জিয়াকে ফোন করে আলোচনার জন্য ডেকেছিলেন। খালেদা জিয়া সেসময় সাড়া দেননি। এরপর তো সবাই জানেনই বিএনপি তার সঙ্গী স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতকে সাথে নিয়ে অবরোধের নামে বেছে নিলো আগুন সন্ত্রাসের পথ। বহু নিরপরাধ মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করেছে বিএনপি-জামাতের সন্ত্রাসীরা।

২০১৮ সালেও ড.কামাল হোসেনের নেতৃত্বে বিএনপি জোট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সংলাপে বসেছিলো। তারা সেই নির্বাচনেও অংশ নিয়েছিলো। এক একটি আসনে একাধিক প্রার্থী দেয়ার পাশাপাশি মনোনয়ন বাণিজ্য সামনে আসায় নির্বাচনের পর থেকেই শুরু হয় মিথ্যাচারের রাজনীতি।

এবার আসা যাক সাম্প্রতিক পরিস্থিতির দিকে। শর্তহীন সংলাপের কথা পিটার হাসই যে নতুন বললেন তা কিন্তু নয়। ২৮ অক্টোবর বিএনপির তাণ্ডবের আগে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব না দিলেও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শর্তহীন সংলাপের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিএনপি একেবারে শুরুতেই তা নাকচ কেও দেয়। মির্জা ফখরুল সাহেব থেকে শুরু করে দুদু-রিজভীরা শর্তজুড়ে দিয়ে বলতে থাকলেন, শেখ হাসিনার পদত্যাগ, নির্দলীয় সরকার মানলেই কেবল সংলাপ। এভাবে শর্ত দিয়ে কি সংলাপ হয়? আপনারা শেখ হাসিনার পদত্যাগ চান তাহলে সংলাপ করবেন কার সাথে?

এবার আরেকটু পিছনের দিকে যাই গত বছরের জুলাই মাসে নির্বাচন কমিশন

রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ ও অংশীজনদের সাথে সংলাপে বসেছিলো। কিন্তু বিএনপি সে সংলাপে যায়নি। শুধু বিএনপিই নয় তাদের সমমনা দলসহ ৯টি দল সংলাপে যায়নি। এমনকি ইসি গঠনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সংলাপে এর আগে দু’বার গেলেও শেষবার তারা গর হাজির। তাদের অভিযোগ ছিলো ইসি গঠনে তাদের কোনো মতামতই নাকি রাখা হয়না। যদিও বর্তমান সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়ালের নামের প্রস্তাবক বিএনপিরই ঘনিষ্ঠ প্রয়াত ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

এবার আবারো আসি সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে। হাস সাহেবরা সংলাপের প্রসঙ্গটি সামনে আনার পর ঠিক সংলাপ আকারে না হলেও নির্বাচন কমিশন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করছে তাদের প্রস্তুতি জানাতে। কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোকে এজন্য আগেভাগেই চিঠিও পাঠিয়েছে। বিএনপির চিঠি পৌঁছেছে পল্টনের কার্যালয়ে। তবে সেখানে চিঠি সংগ্রহ করার মতো কেউ ছিলেন না। চিঠিটি পড়ে আছে কলাপসিবল গেটের ভিতরে একটি চেয়ারে। চিঠি যাওয়ার খবর শুনে অজ্ঞাত স্থান থেকে রুহুল কবির রিজভী বরাবরের মতোই এ নির্বাচন কমিশনের আলোচনায় যাবেন না বলে জানিয়ে দেন।

এতোদিন বিএনপি যাদের ওপর নির্ভর করেছিলো, যে পিটার হাসকে অবতার ভাবতে শুরু করেছিলেন বিএনপির নেতারা এখন তার প্রস্তাব করা সংলাপেও ভরসা রাখতে পারছে না দলটি। আসলে দলটি কি চায়? তারা তো সংলাপ চায় না। সংলাপ চাইলে কি ২০১৪ সালে খালেদা জিয়া শেখ হাসিনার সংলাপের প্রস্তাবটি অসৌজন্যমূলকভাবে প্রত্যাখান করতে পারতেন?

বিএনপি তার পুরোনো অবস্থান থেকে একচুলও সরেনি। সংলাপে নয় অবরোধের আগুনেই ভরসা রাখছে তারা। বিএনপি যে সহিংস সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে তার প্রমাণ তারা প্রতি পদে পদেই দিচ্ছে। আসলে তারা কোনোকালেই জনতায় ভরসা রাখতে পারেনি। তারা চিনেছে শুধু ক্ষমতা তাও আবার পেছনের দরজা দিয়ে। মিলিটারি ডিক্টেটর জিয়াউর রহমান পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখল করে বিএনপির জন্ম দিয়েছিলেন। হ্যাঁ- না ভোট, ২০০১ সালের কারচুপির নির্বাচন, ২০০৭ সালে ক্ষমতা ছাড়তে টালবাহানার পর এখন সহিংসতার পথে রক্তপাত ঘটিয়ে ক্ষমতা চায় দলটি।

বিএনপিকে বলবো যাদের ওপর আশা করে আছেন, যাদের মুরুব্বি মেনেছেন, যাদের প্রভু ভাবছেন তাদের কেউই আপনাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিতে পারবে না। তাই আগুন সন্ত্রাসের পথ ধরে ক্ষমতায় যাওয়ার আশা ছেড়ে জনতায় ভরসা রাখুন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো- দলটি কি পারবে লন্ডনি প্রেসক্রিপশন থেকে বেরোতে? যদি না পারে তাহলে ওই

প্রবাদটিই সত্য বলে ধরে নিতে হবে ‘চোরাই না শোনে ধর্মের কাহিনী’।

লেখক: সাংবাদিক ও সাবেক ছাত্রনেতা।

সাবধান! চারদিকে বিদ্বেষ…

এই লেখাটি লিখতে বসে উগ্র জাতীয়তাবাদ চর্চার প্রবর্তক অ্যাডলফ হিটরারের তথ্যমন্ত্রী গোয়েবলসের সূত্রটি খুব মনে পড়ছে। মিথ্যাকে সত্য বানানোর একটি সূত্র দিয়েছিলেন তিনি। এই সূত্র অনুসরণ করা সভ্যতা বিবর্জিত, সন্দেহ নেই। কিন্ত এটি যে খুব সত্য সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি বলেছিলেন একটি মিথ্যা বার বার বলতে থাকলে তা এক সময় বেশিরভাগ মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে। একটি মিথ্যা বার বার বলে সত্য বানানোর একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ আমাদের সবার সামনে এই মুহূর্তেই আছে। কিন্তু সেটি আপাতত মনে করিয়ে দিচ্ছি না। শুধু বলছি, এখন আমাদের চারদিকে বিদ্বেষ। আমারা বিদ্বেষের সাগরে ডুবে যাচ্ছি।

বলছি বর্তমান সময়ের কথা। আজ থেকে ২০ বছর আগে হলে হয়তো কোন বিদ্বেষ সামনে আসলে বেশিরভাগ মানুষ সেটা বিচার বিবেচনা করে, ধরে ফেলতে পারতো। তিনি হাতে সময় পেতেন। কিন্ত এর এখন পরিমাণ এতি বেশি যে, মানুষ নিজস্ব বিবেচনা প্রয়োগ করার সময় পাচ্ছে না। একটা ঘটনা আসতে আসতে আরেকটা চলে আসে। তিনি কোনটা রেখে কোনটা বিবেচনায় আনবেন? তাই তিনি এখন ভাবেন, এত বিচার বিবেচনায় যাওয়ার চেয়ে ঘটনা শুনে ভুলে যাওয়াই ভাল। কিন্ত কোন ঘটনা শোনার পর পুরোপুরি ভুলে আসলে যাওয়া যায় না, মনে একটা ছাপ কিন্তু থেকেই যায়। আর এভাবেই তিনি হাজারটা বিদ্বেষের অন্ধকারে ডুবে যান।

এই বিদ্বেষ নিয়ে জাতিসংঘের একটি ওয়েব পেজে সবচেয়ে কার্যকর কথাটি বলেছেন, জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস। তিনি সেখানে বলেন, মানুষ ইন্টারনেটে অভ্যস্ত হওয়ার পর সমাজে বিদ্বেষ ছড়ানোর মাত্রা বেড়েছে। এটি এখন আমাদের রাষ্ট্রীয় এবং সমাজ জীবনের অন্যতম ঝুঁকি। কারণ প্রথাগত গণমাধ্যমের চেয়ে অনলাইলইনে বিদ্বেষ ছড়ানো

অনেক সহজ। পদ্ধতির কারণে এখানে একটি বিদ্বেষ বার সামনে আসতে পারে এবং বার বার বহু মানুষকে এর সঙ্গে জড়াতে পারে। অনলাইনে বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্যে, তিনি বার বার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পদ্ধতিগত দুর্বলতা এবং মনিটরিং এর সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

এই ওয়েব পেজেই বলা হয়, বিশ্বব্যাপী ইস্যুটি মোকাবেলা করার জন্য জাতিসংঘ বিদ্বেষ বার্তার একটি কাঠামো দিতে চায়। এরইমধ্যে তারা কোন ধরণের বার্তা বিদ্বেষ হিসাবে চিহ্নিত করবে, সেব্যাপারে একটি প্রাথমিক ধারণা দিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে সেটাই হচ্ছে বিদ্বেষ বার্তা, যার মাধ্যমে সমাজে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার শঙ্কা থাকে। সেই বক্তব্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেমন হতে পারে, আবার হতে পারে কোন গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের নামেও। কোন আচরণ, বক্তব্য বা লেখায় আক্রমণ বা অবমাননাকর বা বৈষম্যমূলক ভাষা ব্যবহার করলেও সেটা বিদ্বেষ বার্তা হিসাবে বিবেচিত হবে।

আজ অবধি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধীনে বিদ্বেষ বার্তার কোনো সর্বজনীন সংজ্ঞা তৈরি হয়নি। বিষয়টি নির্মাণের পর্যায়ে আছে। তাই আপাতত জাতিসংঘের আভাস ধরে আমরা বলতে পারি, যে বার্তায় সমাজের শান্তি নষ্ট হয় সেটাই বিদ্বেষ বার্তা। মূল বিষয় বিষয় হচ্ছে শান্তি ভঙ্গ। কিন্তু স্থান কাল পাত্র ভেদে একই রকম বার্তায় একটি সমাজে শান্তি ভঙ্গ হতে পারে আবার আরেকটি সমাজে নাও হতে পারে। মূল বিষয় হচ্ছে সমাজ বুঝে বার্তাটি ছড়ানো।

সমাজ বোঝার প্রসঙ্গ আসলেই পরিকল্পনার প্রসঙ্গটি চলে আসে। আর কোন একটি উদ্দেশ্য পূরণের জন্যেই কেবল মানুষ সময় দিয়ে, অর্থ দিয়ে সমাজ বোঝে। আর সেই উদ্দেশ্য যদি অসৎ হয় তাহলেই বলতে হবে ছড়ানো বার্তাটি বিদ্বেষ বার্তা। এখন আমরা মোটামুটি এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, অসৎ উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে কোন বার্তা ছড়ানো হলে সেটাকে আমরা বিদ্বেষ বার্তা বলবো।

যাই হোক, গুতেরেস এবং জাতিসংঘের প্রসঙ্গ এই লেখায় আনলাম কারণ, তারা কথা বলছিলেন, বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে। সেখানে বিদ্বেষ বার্তার অ্যাকাডেমিক আলোচনাই ছিল মুখ্য। আন্তর্জাতিক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রাধান হিসাবে তাঁর সেটাই করার কথা। তিনি কোন সমস্যা সমাধান করতে চাইলে আগে কাগজে কলমে করবেন। তার পর সমাজে নিয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি যদি এই বিদ্বেষ বার্তার সামাজিক প্রভাব কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা দেখতে চাইতেন তাহলে তার বাংলাদেশের

দিকে মনোযোগ দেয়া দরকার ছিল।

খুব মোটা দাগে বিদ্বেষ ছড়ানোর একটি উদ্যোগ সম্প্রতি ফাঁস হয়েছে বাংলাদেশে। যে কারণে পরিকল্পনাকারীরা সেই বিদ্বেষের সবটা ছড়াতে পরেনি। কিন্তু বিদ্বেষ বার্তা ছড়ানোর দু’জন মানুষ চিহ্নিত হয়েছে। এখানে বলে রাখা ভাল যে আমার লেখার উদ্দেশ্য সমাজে বিদ্বেষ ছড়ানোর কুফল সম্পর্কে বলা। যে কারণে সেই চিহ্নিত দু’জন মানুষের নাম এবং নির্দিষ্ট কাজের কথা উল্লেখ করছি না। তার দরকারও নেই। কারণ এরই মধ্যে প্রচলিত গণমাধ্যমে এসব বিস্তারিত এসেছে।

এখন বলা যায় পরিকল্পিতভাবে তারা একটি চূড়ান্ত বিদ্বেষ প্রচার করতে চাচ্ছিলেন। যেটা একটি দেশের বেশিরভাগ মানুষের কাছে সত্য মনে হয়। যার ওপর ভর করে একটি রাষ্ট্রের সরকারের মত একটি প্রতিষ্ঠান উৎখাত হতে পারে। এরই মধ্যে প্রকাশ্য হয়েছে যে, তারা এই কাজটি করার জন্যে দির্ঘদিন প্রস্তুতি নিয়েছেন। বাংলাদেশের মানুষের মন ও মনন বিশ্লেষণ করেছেন। অতঃপর বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্যে মাঠে নেমেছেন। এখানে তাদের বিদ্বেষ ছড়ানোর আরও উদাহরণ দেয়া যেতো। সেটা প্রাসঙ্গিকও হতো। কিন্তু সেই ছোট্ট গবেষণাটি আমার পাঠকের জন্যেই রেখে দিলাম। কারণ তার হাতের কাছেই ইন্টারনেট। আমি যা দেবো, এক ক্লিকেই তিনি তার ১০গুণ বেশি দেখে নিতে পারবেন।

যাই হোক। যে কেউ একটি সরকার বা মত, দর্শন কিম্বা ব্যক্তির বিপক্ষে অবস্থান নিতে পারেন। লিখে, বলে, অবস্থান নিয়ে বা যে কোন উপায়ে এর প্রতিবাদ করতে পারেন। তিনি তার মতের পক্ষে জনমত গঠন করতে পারেন। খুব কড়া যুক্তি দিয়ে, তথ্য দিয়ে সমালোচনা করতে পারেন। ধরা যাক একটি রাজনৈতিক দল একটি দেশের সরকার পরিচালনা করছে। পরিচালনা করতে গিয়ে তারা কিছু অনিয়ম করছে। যার প্রভাবে মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে। কেউ যদি এর সালোচনা করতে চান, তাহলে তিনি সেই অনিয়ম নিয়ে কথা বলবেন। নিয়মটা কী হওয়া উচিত সেটাও বলবেন প্রকাশ্যে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নিজের মত প্রতিষ্ঠায় তারা আর যাই করুণ বিদ্বেষ ছড়াতে পারবেন কী? কারণ বিদ্বেষ ছড়ালেই তো প্রশ্ন উঠবে কাজটি তিনি কেন করছেন? উদ্দেশ্য কী? নানা আপত্তি উঠবে। গুতেরেসের এত কথা বলার পর সেই আপত্তি, আর কারও ব্যক্তিগত আপত্তি নেই। হয়ে গেছে সভ্যতা রক্ষার আপত্তি। পাঠক ভাবুন, বিদ্বেষের মত ভয়ঙ্কর বিষ ছড়ানোর দরকার হয় কখন? যখন একটি সত্যের ওপর মিথ্যার প্রলেপ দেয়ার দরকার। আর বিদ্বেষ ছড়িয়ে যদি দুর্বৃত্ত সফল হয়ে যায় সেই

প্রলেপযুক্ত মিথ্যাটি বর্তায়, যাদের মধ্যে সেটি ছড়িয়েছে, তাদের ওপর। যেটা ওই মানব গোষ্ঠীর জন্যে বছরের পর বছর কাঁধে বয়ে বেড়ানোর শঙ্কা তৈরি হয়।

কিন্তু সবচেয়ে ভয়ঙ্কর তথ্য হচ্ছে, আমরা চাইলেই এখনই এই বিদ্বেষ ছড়ানো বন্ধ করতে পারবো না। অনলাইনে তো আরও না। জাতিসংঘের বার্তা অনুযায়ী কাজ চলছে প্রতিরোধের। কিন্তু কবে নাগাদ মানুষ এই বিদ্বেষ বার্তা থেকে সুরক্ষা পাবে তা এখনও নিশ্চিত নয়। তাহলে উপায় কী? এরকম চলতেই থাকবে? ততদিনে যে ক্ষতি হবে এর দায় কে নেবে? সুতরাং আমাদের বিদ্বেষ ছড়ানো বন্ধের তাৎক্ষণিক সমাধান চাই।

আমি প্রচলিত গণমাধ্যমে কাজ করছি ২৫ বছরের বেশি। আমার চিন্তা বলে, এই বিদ্বেষ নিয়ে প্রথম প্রতিরোধটা আসা উচিত প্রচলিত গণমাধ্যমের কাছ থেকে। কোন বার্তা ছড়ালেই সেটা সমাজের জন্যে বিদ্বেষ কী না তাদেরকেই প্রথম চিহ্নিত করতে হবে। কারণ তারা ওই সমাজের মানুষ নিয়েই কাজ করে। সামাজের আদি নাড়ি নক্ষত্র তাদের জানা। আমি যুদ্ধে নামতে বলি না। শুধু বলি বিদ্বেষটা কেন ছড়ানো হলো? কে ছড়ালো? কী ভাবে ছড়ালো? কিসের বিনিময়ে ছড়ালো ? সত্যটা কী? এরকম কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেই হবে। মাধ্যমটা যেহেতু “গণ” সেহেতু “গণ” এর প্রতি তাদের একটা দায় আছে বৈকী?

তবে ইচ্ছে থাকলেও গণমাধ্যমের পক্ষে অনেক সময় এই দায় নেয়া অসম্ভব হতে পারে। কারণ একটি গণমাধ্যমে কিছু প্রচার হতে হলে, প্রমাণ অপ্রমাণের বিষয় থাকে। তথ্য সূত্র লাগে। পক্ষ বিপক্ষ লাগে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মত সে চাইলেই কিছু একটা লিখে দিতে পারে না। যে কারণে অনেক বিষয় সত্য বুঝতে পারলেও, সে সত্য প্রকাশ করতে পারে না। এক্ষেত্রে শেষ ভরসা সমাজের মানুষ। আমি মানুষের বোধের ওপর সবচেয়ে বেশি ভরসা করি। তাই যেসব মানুষ দাবি করেন, তাদের বোধ শক্তি প্রখর তাদেরই বিদ্বেষ রোধে এগিয়ে আসতে হবে। আমি তাকেও যুদ্ধে নামতে বলি না। শুধু বলি, আগে নিজে বিষয়টি বুঝুন এবং যিনি বোঝেন না তার সঙ্গে আলোচনা করুন। জাতিসংঘও কিন্তু বিদ্বেষ ছড়ানো বন্ধের জন্যে মিডিয়া লিটারেসি বা গণমাধ্যম স্বাক্ষরতার কথা বলছে। এই মিডিয়া লিটারেসি আসলে বোধ সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বাড়ানো ছাড়া আর কিছু নয়।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

বিএনপির জ্বালাও পোড়াও রাজনীতির অবসান হবে কি?

বিএনপির জ্বালাও পোড়াও রাজনীতির অবসান হবে কবে? এই প্রশ্নটিই বর্তমান লেখাটির শিরোনাম করা হয়েছে! বিএনপি ইতোমধ্যে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দলীয় সম্পৃক্ততার কারণে অনেকে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করলেও কানাডার আদালতের রায় এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই।
এখবর এখন পক্ষে-বিপক্ষের সবারই জানা যে, কানাডার আদালত পঞ্চমবারের মত বিএনপি-কে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে আখ্যায়িত করে রায় দিয়েছে। সেই বিএনপি গত ২৮ অক্টোবর (২০২৩) ঢাকায় তাদের মহাসমাবেশ থেকে রাজনৈতিক সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটায়। ‘পলিটিক্যাল ইকোনোমি অব এনার্জি ট্রঞ্জিশন’ এর প্রফেসর ফ্রাঁসোয়া ব্যাফোইল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের রাজনীতির সাথে ‘হ্যালুসিনেশনের’ মিল খুঁজে পেয়েছেন।
যদিও ২৮ তারিখে সমাবেশ করার অনুমতি নেয়ার সময় ঢাকা মহানগর পুলিশের কাছে ‘শান্তিপূর্ণ’ সমাবেশ করা হবে বলে অঙ্গীকার করেছিল বিএনপি নেতৃত্ব। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল দায়িত্বপালনরত একজন পুলিশ সদস্যের ওপর লাঠি হাতে বোধশূন্য উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বিএনপির নেতা-কর্মীরা বেধড়ক পেটানো শুরু করে।
বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী আগে থেকেই সতর্ক ছিলেন। সমগ্র এলাকা এবং তার আশে-পাশে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো ছিল। ফলে, যেসব ঘটনা ঘটেছে সেইসব কিছুই সিসিটিভির ভিডিওতে ধারণ করা হয়েছে।
একটি ভিডিওতে দেখা যায়, এক পুলিশ সদস্য মুমূর্ষু অবস্থায় ফুটপাতে পড়ে আছেন। পাশের গলি থেকে কয়েকজন বেরিয়ে এলো এবং একজন হাতের লাঠি দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা সেই অসহায়, আহত পুলিশ সদস্যকে ভয়ংকর নিষ্ঠুরতার সঙ্গে পেটাতে থাকল। হতভাগ্য সেই পুলিশ সদস্য দুর্বলভাবে হাত নাড়াচ্ছেন। অর্থাৎ তখনও বেঁচে আছেন। মুহূর্তেই লাঠি হাতে ছুটে এলো আরও অনেকে এবং লাঠি দিয়ে নৃশংসভাবে পেটাতে থাকল। কেউ একজন সেই পুলিশ সদস্যকে কোপাতে থাকে। নিথর পড়ে থাকা একজন মানুষকে অনেকে মিলে উন্মাদের মতো আঘাতের সেই দৃশ্য অসহনীয়! কিন্তু আঘাতকারীদের মধ্যে কোনো দ্বিধা বা দয়ার উদয় হয় নাই। ঢাকা মহানগর পুলিশের কনস্টেবল আমিরুল ইসলাম পারভেজকে যে বর্বরোচিতভাবে হত্যা করল বিএনপি-জামায়াতের কর্মীরা, টেলিভিশনের পর্দায় সে দৃশ্য দেখে চোখের পানি আটকাতে পেরেছে, এমন লোক কমই

আছে। পারভেজের পিতা সেকান্দার আলী মোল্লা ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ভাবতে অবাক লাগে স্বাধীন বাংলাদেশের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে দায়িত্বপালন করতে যেয়ে বিএনপির নেতা- কর্মীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়!
আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, মাটিতে পড়ে যাওয়া পুলিশ সদস্যকে লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে অনেকে। কেউ কেউ মুখে ইটের টুকরো দিয়ে বারবার আঘাত করছে; শরীরের ওপর উঠে লাথি মারছে। পুলিশ সদস্যের ওপর নিষ্ঠুরভাবে লাঠি ও চাপাতি দিয়ে যারা করেছে তারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাজেরই লোক। সহিংসতার উন্মত্ততায় মেতে ওঠা এইসব লোক আমরা যে সমাজে বসবাস করি সেই সমাজেরই একটি অংশ। তারা বিএনপি-জামায়াত-এর নেতা- কর্মী। ভাবতে কষ্ট হয়, নির্মম এসব লোক আমাদেরই সমাজের! যে সমাজে এমন মানবিকতাবিহীন লোকেরা ঘুরে বেড়ায়, সেই সমাজ নাগরিকদের জন্য কতটা বিপজ্জনক আর ঝুঁকিপূর্ণ! সেই চিন্তা আমাদের ভীত আর বিপর্যস্ত করে তোলে!
বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে ২৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ শনিবার রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে দলটির নেতা–কর্মীরা সহিংসতায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। এসময় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্ব পালনরত পুলিশ, আনসার ও অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ওপর দলটির নেতাকর্মীরা আক্রমন করে। দায়িত্বপালনরত অবস্থায় এক পুলিশ সদস্যসহ ২ জন নিহত হন। গুরুতর আহত একজন আনসার সদস্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরে মৃত্যুবরণ করেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাকরাইল, মতিঝিল, মগবাজার, হাইকোর্ট মোড়, বিজয়নগর ও আরামবাগসহ বিভিন্ন এলাকায় বিএনপি ও জামায়াত এর নেতাকর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে একজন গুলিবিদ্ধসহ অন্তত তিনশ’ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে ৪১ জন পুলিশ সদস্য এবং ১৮ জন সাংবাদিক রয়েছেন। সংঘর্ষ চলাকালে কাকরাইলে পুলিশ বক্স ও বিভিন্ন স্থানে অন্তত দেড় ডজন গাড়িতে আগুন এবং দুই ডজন যানবাহন ভাঙচুর করে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা।
এদিকে মহাসমাবেশের দিন বিকেলে মালিবাগ ফ্লাইওভারের ওপর বলাকা পরিবহনের একটি বাসে আগুন দেওয়া হয়। ওই বাসে আগুনের ঘটনাটি ধারণ করা একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, যুবদল নেতা রবিউল ইসলাম নয়ন একটি বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরা অবস্থায় বাসটির পাশে ঘুরছেন। বুলেট প্রুফ জ্যাকেটে ‘প্রেস’ লেখা রয়েছে। তার হাতে একটি লাঠি। সঙ্গে বেশ কয়েকজন যুবক।
‘পলিটিক্যাল ইকোনোমি অব এনার্জি ট্রাঞ্জিশন’ এর প্রফেসর ফ্রাঁসোয়া ব্যাফোইল তার ‘দ্য পলিটিক্স অব ডেস্ট্রাকশন’ গ্রন্থে ইউএসএসআর, পোল্যান্ডের পিআইএস পার্টি এবং ইসলামিক স্টেট-এর কর্মকান্ড যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সে অনুযায়ী বাংলাদেশে বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ভিত্তিক রাজনীতির ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যেতে পারে। সামাজিক বিজ্ঞানে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড মনোবিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।

সন্ত্রাসী কর্মকান্ডভিত্তিক রাজনীতির হোতারা ‘স্থান এবং সময়ের’ রেফারেন্স ধ্বংস করে(যেমন ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার নমুনা ধ্বংস করেছিল বিএনপি-জামায়াত জোট); এর পরিবর্তে সন্ত্রাসীদের মূল হোতাগণ তাদের পছন্দমত কোনকিছু দিয়ে ঘটনার ব্যাখ্যা দাঁড় করে থাকেন; এবং আশ্রয়ের জন্য ক্ষতাবান ব্যক্তিদের ভালবাসা বা ঘৃণার ভাব বুঝে সামাজিক স্থানগুলিতে তাদের পছন্দের ব্যক্তিদের নিযুক্ত করে থাকে। কানাডার আদালত কর্তৃক সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত বিএনপির বেলায়ও তেমনটি লক্ষ্য করা যেতে পারে। তাদের কৃত সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে অস্বীকার এবং এটিকে অন্য উপায়ে পুনরুৎ্পাদন করে, যা স্বপ্নদ্রষ্টার (যেমন বিএনপির লন্ডনস্থ নেতা) ইচ্ছার সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সামঞ্জস্য বিধান করে। একারণে সন্ত্রাসীদের থেকে উদ্ভূত রাজনীতির সাথে একটি হ্যালুসিনেশনের (যার অর্থ অমূলক বা বিভ্রান্তির)অনেক মিল রয়েছে। এই বিশ্লেষণের পরে আমরা এই উপসংহারে উপনীত হতে পারি যে, অতীতের ন্যায় বিএনপি তাদের বর্তমানের জ্বালাও-পোড়াও রাজনীতি পরিত্যাগ করবে না। এর জন্য তারা ভিন্ন ব্যাখ্যা এবং তাদের সেই মিথ্যা তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যার সমর্থন তারা দেশের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও পাবে। যেমনটি ইউএনএইচসিআর ২৮ অক্টোবর ২০২৩ বিএনপি-জামায়াত কর্তৃক সংঘটিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে বিভ্রান্তিকর এবং মিথ্যাভাবে উপস্থাপন করছে!এই পরিস্থিতিতে সঠিক ঘটনা যথাযথভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরে বিএনপি-জামায়াতের মুখোশ খুলে দিতে হবে। লেখক: সেন্টার ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ। সাবেক ডিন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, সাবেক চেয়ারম্যান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

আল্টিমেটাম নয়, জনগণ সাথে নিয়ে রাজনীতি করতে হবে

পৃথিবী বদলাচ্ছে, এর সাথে বদলে যাচ্ছে মানুষের মন-মানসিকতা । পৃথিবী বদলের মূল শক্তি হিসাবে কাজ করছে স্থিতিশীলতা, টেকসই উন্নয়ন ও মানবিক প্রগতি । আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে মানুষ একটি স্থিতিশীল পরিবেশের মাধ্যমে নিজেদের এগিয়ে নিতে আগ্রহী হয়ে উঠছে । আজকের বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয় । সবচেয়ে বড় কথা, দেশের জনগণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এমন একটি জায়গায় এসে পৌঁছেছে, যেটি মানুষ আগে সেভাবে ভেবে উঠতে পারেনি।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এর সূচনা ঘটলেও রাষ্ট্র বিরোধী অপশক্তি তা সফল হতে দেয়নি। এরপর বাংলাদেশ ক্রমাগত উল্টোপথে হেটে লক্ষচ্যুত হয়েছে। মানুষ আর আগের মতো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, জ্বালাও পোড়াও, জাতিগত বিদ্বেষ, হত্যাযজ্ঞ, স্বাধীনতার চেতনা বিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিতে চায়না । কারণ যারা স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করেনা, দেশপ্রেম যাদের মধ্যে নেই, যারা মীরজাফর-মোশতাকের মতো বিশ্বাসঘাতকের চরিত্রকে ধারণ করে, তাদের কাছে জনগণের পাওয়ার কিছুই নেই ।

মানুষ এখন বুঝে, কিসে তার ভালো, কিসে তার মন্দ । এর একটা ইতিবাচক ফলাফল এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি । বিরোধীরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনের নামে অরাজকতা তৈরির চেষ্টা করে যাচ্ছে । বিভিন্ন অপকৌশল, গুজব, মিথ্যাচারের মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করে তাদের সভা-সমাবেশগুলোতে সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করতে পারবে বলে তারা যে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিলো তা বাস্তবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে ।

তাদের সমাবেশগুলোতে তাদের নেতা-কর্মীদের দেখা গেলেও সাধারণ মানুষ তাদের এই আন্দোলের সাথে যুক্ত হচ্ছেনা । আবার তাদের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চ্চা নেই বলে অনেক নেতা-কর্মী তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ।

অথচ তারা নিজেদের সীমাবদ্ধতাগুলো বিচার বিশ্লেষণ না করে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রা, উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করতে নানামুখী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে । তাদের নিজেদের শক্তির উপর তারা ভরসা পাচ্ছেনা বলে অন্যান্য শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে, যা দেশের সাধারণ মানুষ ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছেনা । গণতান্ত্রিক দেশে আন্দোলন হতেই পারে, কিন্তু এখন আন্দোলনের নামে অপশক্তিগুলো যা করছে তার কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেই । আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার মতো তাদের কোনো নেতা নেই, আসলে আন্দোলন কেন হচ্ছে সাধারণ মানুষ সেটিই বুঝে উঠতে পারছেনা ।

এর আগে ১০ ডিসেম্বর ২০২২ এ সরকার পতনের আল্টিমেটাম দিয়ে তারা মাঠ গরম করলেও সেখানে সাধারণ মানুষের কোনো ধরণের সম্পৃক্ততা ছিলো না । বরং সেটা একটা প্রহসনের নাটকে পরিণত হয়েছিল । সাধারণ জনগণ বলছেন, যত গর্জে, তত বর্ষে না। সেই ধারবাহিকতায় ২৮ অক্টোবরকে টার্গেট করে মাঠে নামে দলটি। এর মূল উদ্দেশ্য কি, কেন এই আন্দোলন, এতে কাদের মঙ্গল, জনগণ তা বুঝে উঠতে পারছে না ।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, তাদের মূল উদ্দেশ্য নির্বাচন নয়, বরং রাষ্ট্র যে একটি স্থিতিশীল অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে তার গতিকে রুদ্ধ করা । যদি মনস্তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়, তবে এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে তারা জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় একধরণের সংকটের মধ্যে পড়েছে । এর দায়দায়িত্ব তাদের নিজেদের, তাদের অতীত কৃতকর্মের ।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, তাদের মধ্যে নির্বাচন ভীতি কাজ করছে, কারণ তারা বুঝতে পেরেছে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রের ভিত্তি এখন অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে, সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে, উন্নয়ন পরিকল্পনায় ফাইলবন্দী হয়ে না থেকে বাস্তবে পরিণত হয়েছে, মানুষ দৃশ্যমান উন্নয়ন দেখছে, সেই উন্নয়ন মানুষের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে যোগসূত্র গড়ে দিয়েছে । উন্নয়নের সাথে সাথে উন্নয়নের নীতিমালা প্রণীত হয়েছে । প্রযুক্তির উৎকর্ষতা মানুষের জীবনে গতি এনে দিয়েছে, মানুষের কর্মযজ্ঞ দেশের গন্ডি পেরিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে । তরুণদের মধ্যে একসময় যে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি ছিল, তা এখন আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসে পরিণত হয়েছে । এর ফলে মাথায় হাত বুলিয়ে তরুণদের তারা আর বিপথগামী করতে পারছেনা, বরং তরুণরা তাদের এই ধরণের কার্যকলাপকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মূল্যায়ন করছে ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যার পর থেকে ইতিহাসকে তারা নিজেদের মতো করে লিখেছিলো, প্রচার করেছিল । ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে প্রজন্মের পর প্রজম্মের উপর তারা মিথ্যাকে চাপিয়ে দিয়েছিলো । তারা ভেবেছিলো, মানুষ তাদের এই বিকৃত ইতিহাসকে সত্য বলে মেনে নিয়ে নিজেদের শেকড়ের শক্তি থেকে পথচ্যুত হবে । বাস্তবে তা ঘটেনি, বরং মানুষ এখন ইতিহাস জানছে, প্রামাণ্য দলিল থেকে উঠে আসছে ইতিহাসের নিখাদ সত্য । প্রমাণিত হচ্ছে. ইতিহাস বিকৃতির পিছনের কুশিলরাই ছিল দেশ ধ্বংসের মূল ক্রীড়ানক । বাঙালির আবহমান সাহিত্য, সংস্কৃতি, সম্প্রীতি, বিশ্বাস ও ভালোবাসার উপর তারা বিষ ঢেলে দিয়ে মনে করেছিল, বাংলার আপামর মানুষ ভুলে যাবে তাদের নিজেদের অস্তিত্বকে । তেমনটা ঘটেনি, বরং মানুষ এখন আরও বেশি সৃজনশীল, আরও বেশি মননশীল, আরও বেশি অগ্রসরমান হয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাদের অবদান রাখছে ।

সারা পৃথিবীতে সংলাপ ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অনেক সংকটের সমাধান হলেও তারা সংলাপেও ভয় পাচ্ছে । সংলাপের আগেও অযৌক্তিক শর্ত জুড়ে দিয়ে তারা জনগণকে বুঝাতে চাইছে, তারা সংলাপ চাইলেও সরকার সংলাপে

আগ্রহ দেখাচ্ছেনা । তাদের এই ধরণের দ্বিমুখীতা সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার পন্থা বলেই বিবেচিত হচ্ছে । নির্বাচন কমিশন তাদের সংলাপে ডাকলেও তারা সাড়া দেয়নি । সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে, তারা শান্তি চায়না, সংলাপ চায়না, নির্বাচন চায়না, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশকে অস্থিতিশীল অবস্থার মধ্যে পতিত করা, পরনির্ভরশীল করা, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা, প্রকৃত স্বাধীনতাকে হরণ করা । সারাদেশেও তারা আন্দোলন করতে পারছেনা,কারণ সারাদেশের তৃণমূল মানুষ বুঝতে পেরেছে, তাদের এসব আন্দোলনে জনগণের কোনো কল্যাণ নেই, বরং এসব আন্দোলন জনগণকে জিম্মি করার মাধ্যমে পিছিয়ে দেবার অপচেষ্টা । এখন তারা বলছে, আন্দোলন হবে ঢাকা কেন্দ্রিক । অথচ যেখানে জনগণের কোনো আগ্রহই নেই, সেই নিষ্ফল আন্দোলনের মূল্যইবা কতটুকু ।

এই সময়ে এসে যখন বাংলাদেশের মানুষ চিন্তা ও চেতনাকে ধারণ করে নিজেদের এগিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিচ্ছে তখন তাদের এই কর্মকান্ডকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। নির্বাচন করতে হলে গণতন্ত্রকে মানতে হবে, রাষ্ট্রের সংবিধানকে অনুসরণ করতে হবে, স্বাধীন নির্বাচনী ব্যবস্থার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে । সবচেয়ে বেশি দরকার জনগণের বিশ্বাস ও ভালোবাসা অর্জন করা, জনগণকে বুঝা, জনগণের সুখে দুঃখ অনুধাবন করে নিজেদের দেশপ্রেমিক হিসাবে প্রমান করা । এগুলোর বিন্দুমাত্র লক্ষন তাদের ভিতরে নেই । সাধারণ জনগণ খুব কাছ থেকে দেখেছে, তারা জনগণের জন্য কল্যাণমুখী উদ্যোগগুলোতে কিভাবে বাধা সৃষ্টি করেছে । পদ্মা সেতু এর একটি অন্যতম উদাহরণ । পদ্মা সেতুর মতো সব উন্নয়নকেই তারা বাধাগ্রস্থ করে জনগণের শত্রু হিসাবে কাজ করেছে, অনেকটা ট্রয়ের ঘোড়ার মতো । জনগণ এখন জানে, তারা সাধারণ মানুষের ভালো চায়না, বরং সাধারণ মানুষদের তারা নিজেদের প্রতিপক্ষ মনে করে । কারণ তারা মানুষের অধিকারের শক্তিতে বিশ্বাস করেনা, তারা বিশ্বাস করে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতাকে কিভাবে কুক্ষিগত করা যায় ।
দেশের সাধারণ মানুষ, এখন রাজনীতি বুঝে, অর্থনীতি বুঝে, নিজেদের পায়ে মাথা উঁচু করে গর্বের সাথে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, আমরাও পারি, কেউ আমাদের রুখবার মতো নেই । যারা আন্দোলন আন্দোলন খেলছেন, তারা যত দ্রুত এগুলো বুঝতে পারবেন, তত তাদের মঙ্গল, তা না হলে রাজনীতি থেকে তাদের চিরকালের জন্য নির্বাসিত হতে হবে, তখন কপাল চাপড়িয়ে ভাগ্যকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ হবেনা ।
লেখক: অধ্যাপক, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা অর্থনীতিকে আরও চাপে ফেলতে পারে

দীর্ঘ স্থিতিশীল সময় পার করে ফের আমরা একটি অস্থিতিশীল সময়ে প্রবেশ করলাম। অস্বীকার করার উপায় নেই যে মূল্যস্ফীতি এমনিতেই বাড়ন্ত ছিল।এর প্রভাবে বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি জনজীবনে একধরণের দুর্ভাবনা তৈরি করেছে। অনানুষ্ঠানিক কাজে যুক্ত এবং নির্দিষ্ট কম আয়ের মানুষের জীবনচলা বেশ কষ্টের মধ্যেই ছিল।এরই মধ্যে গত ২৮ অক্টোবর (২০২৩) বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচির ফলে যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অনিশ্চয়তা তৈরি হলো তার কারণে সরবরাবহ চেইনে বড় বিপর্যয়ের শঙ্কা তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ গ্রামগঞ্জ থেকে যেসমস্ত সবজি বা অন্যান্য পণ্য ঢাকা শহরে আসবে বা ঢাকা শহর থেকে সেখানে যাবে সেগুলোর সাপ্লাই সাইড বিঘ্নিত হবে।

আমরা জানি, এই সাপ্লাই সাইড যখন বিঘ্নিত হয় তখন সরবরাহ কমে গিয়ে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। এমনিতেই ঢিলেঢালা মুদ্রানীতির প্রেক্ষাপটে টাকার পরিমাণ বাজারে বেশি আছে। তাই চাহিদার চাপ তো আছেই।এই দুই-এ মিলে জিনিসপত্রের দাম আরও বাড়ার আশঙ্কা করছি আমরা। ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি সবজি-আলু-চালের মতো নিত্যপণ্যগুলোর দাম ক্রমেই বাড়ছে। সুতরাং হরতাল ও অবরোধের মতো কর্মসূচির জেরে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হলে জিনিসপত্রের দাম বাড়বেই। রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকলে আরও যেটি ঘটে তা হচ্ছে, মানুষের মনে এক ধরণের আস্থাহীনতা তৈরি হয়, যার কারণে বিনিয়োগ কমে। এ রকম অস্থির সময়ে মানুষ বিনিয়োগ করতে চায় না। নতুন করে ব্যবসা-বাণিজ্য হাতে নিয়ে নতুন ঝুঁকি নিতে চায় না।

রাজনৈতিক দলগুলো যেহেতু মানুষকে নিয়ে কাজ করে তাদের কিন্তু এটা খেয়াল করা উচিত, যে তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে মানুষের আয় রোজগার কমে যাচ্ছে কি না।বিশেষ করে নগরে অনানুষ্ঠানিক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করা মানুষের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। তাঁরা যদি রাস্তায় দাঁড়াতেই না পারে, তারা যদি ভ্যান নিয়ে চলাফেরা না করতে পারে,

পণ্য যদি ট্রাকে করে না আসতে পারে, তাহলে এর প্রভাবে তো মানুষের আয় রোজগার কমবেই। সেইসঙ্গে অবধারিত ভাবেই বাড়বে জিনিসপত্রের দাম। সব মিলে একটি ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা যে তৈরি হবে তা বলার অপেক্ষাই রাখে না।

যারা অনানুষ্ঠানিক কাজ করেন, সেই শ্রেণিটি সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হবেই। আর যাদের আয় মোটামুটি ফিক্সড তারাও ক্ষতির মুখে পড়বে।এই স্বল্প আয়ের মানুষদের আয় না বাড়লেও জিসিসপত্রের দাম তো বাড়ছে। কিন্তু স্বল্প আয়ের মানুষদের আয় তো আমরা বাড়াতে পারছি না। অথচ তাদের বেশি দামে জিনিসপত্র কিনতে হচ্ছে। বিশেষ করে তাদের কাছে খাদ্য মূল্যস্ফীতি অসহনীয় হয়ে উঠেছে।রাজনৈতিক অস্থিরতায় এই খাদ্য মূল্যস্ফীতি আরও বাড়বে।ইতিমধ্যে ১২% এর বেশি খাদ্য মূল্যস্ফীতির মধ্যে রয়েছি আমরা। আমার ধারণা ২৮ অক্টোবর থেকে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হলো এতে মূল্যস্ফীতির হার আরও বাড়বে। এর মধ্যে খাদ্যের দামই বেশি বাড়বে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে। এক্ষেত্রে বলব, সরকারের যে সমর্থন আছে মূল্যস্ফীতি হ্রাসের পদক্ষেপ হিসেবে, টিসিবি মাধ্যমে খাদ্য বিক্রি করে জনদূর্ভোগ কমানো। অনুরোধ থাকবে, টিসিবির খাদ্যপণ্য বিক্রির এই পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। ব্যক্তিখাতের উদ্যোক্তারাও তাদের কারখানায় কর্মরত শ্রমজীবি মানুষের জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে আরেকটু সদয় হতে পারেন।এর ইতিবাচক প্রভাব বাজারে পড়বে। কিছুটা হলেও সাধারণের স্বস্তি নিশ্চিত করা যাবে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত হবে, যতো ধরণের আন্দোলন তারা করতে চায় তারা করুক, সমাবেশ করতে চায় তারা করুক, কিন্তু রাস্তঘাট বন্ধ করা হবে না-এই অঙ্গীকারটি তাদের করা উচিত। হরতাল-অবরোধের যে সংস্কৃতি পুরনায় চালুর চেষ্টা চলছে, এটা তো আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। এটা আবার চালু করাতে যে সমস্যা সৃষ্টি হলো, এর প্রভাব ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সার্বিক ভাবে জনজীবনের সব কিছুর ওপরে পড়বে বলে ধরেই নেওয়া যায়। শিক্ষাখাতেও তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এই সময়টায় স্কুলে স্কুলে পরীক্ষা হবার কথা। শিক্ষার্থীদের কী হবে?পরিস্থিতি এমন চললে, যারা ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেছেন, তারা সময় মতো টাকা ফেরত দিতে পারবেন না। এতে আরও নতুন সংকট তৈরি হবে।

আমরা জানি, বর্তমানে মূল্যস্ফীতির পর দেশের অর্থনীতিতে এখন বড় সংকট হচ্ছে ডলার সংকট। এই সময়টাতে আমরা আশা করছিলাম, সংকট কাটিয়ে একটি সুস্থিতিশীলতার দিকে যাব। প্রণোদনা বাড়ায় সবে মাত্র

প্রবাসী আয় বাড়তে শুরু করেছে।আর এই সময়টাতেই শুরু হলো এই অনিশ্চয়তা।নির্বাচন বা রাজনৈতিক অস্থিরতা যদি সমঝোতার মাধ্যমে স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে গড়াতো তাহলে বাইরে থেকে রেমিটেন্স আরও বেশি আসতো। আমাদের রপ্তানি আয় আরও বাড়তো। সেইসঙ্গে বিনিয়োগও হয়তো বাড়তো। সব মিলে কর্মসংস্থানের ক্ষতি হতো না। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে এখন তো মনে হচ্ছে-এসবই আশার কথা। বাস্তবে তো বেশ চাপের মধ্যেই পড়লো দেশের অর্থনীতি।

রাজনৈতিক সংকটের প্রভাব সরাসরি অর্থনীতিতে পড়লেও এর সমাধান রাজনৈতিক ভাবেই হতে হবে। এখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের খুব বেশি কিছু করার নেই বলেই মনে করি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেটা করতে পারে সেটা হলো মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য আরও যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে, বিশেষ করে মুদ্রানীতিতে কঠোর হওয়ার যে সুযোগ, সেটা তারা করতে পারে। এছাড়া একেবারে সাধারণ মানুষের জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে-যেমন কৃষি, এসএমই, কুটির শিল্পতে যে সহযোগিতা (ঋণ) তারা দেয় সেটার পরিমাণ আরও বাড়ানো। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবসা- বানিজ্যে দেয় ঋনের কিস্তির সংখ্যা বাড়াতে পারে। অথবা আরেকটু নমনীয় করতে পারে। এই সময়টা আসলেই অনেক কঠিন, যেসব জায়গাতে প্রাকৃতিক দূর্যোগ ঘটেছে, সেসব জায়গায় সরকার অবশ্যই আলাদা উদ্যোগ নিয়েছে, এটা হয়তো আরও নিতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংককেও এসব জায়গার ব্যাংকিং ব্যবস্হায় নমনীয়তার জন্য নীতিপরামর্শ দিতে হতে পারে।কিন্তু সমস্যা হবে এসব জায়গাতেও যদি সার পাঠাতে চায় সরকার পাঠাবে কি করে যদি অবরোধ থাকে? তবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিশ্চয় বাড়তি সামাজিক সুরক্ষা সরকার দিতেই পারে।সে জন্য আমার মনে হয় রাজনৈতিক আন্দোলন চলুক কিন্তু অর্থনীতির পায়ে কোনো বেড়ি দেওয়া উচিত হবে না।

রাজনৈতিক দলগুলোতে যারা অর্থনীতি জানেন-বোঝেন তারা যে সংকটটি আঁচ করতে পারছেন না তা কিন্তু নয়। তারা ঠিকই বোঝেন কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য হলো কেবলমাত্র রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন। সেটা অর্জন করতে গিয়ে তারা মানুষের জন্য কি দূর্ভোগ সৃষ্টি করেন তা এতোটা আমলে নেন না। সেটার জন্য সমস্যা যারা মোকাবেলা করেন সেই সাধারণ মানুষেরা তখন সেই রাজনৈতিক দল থেকে নীরবে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এজন্য আমাদের মনে হয়, রাজনৈতিক দলগুলোর খেয়াল করা উচিত তাদের কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষ কিভাবে আহত হয়, কিভাবে তাদের আয় রোজগার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওইদিকে তাদের অবশ্যই নজর রাখা উচিত।

আমরা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখছি, রিজার্ভ সংকট নিয়ে অনেক কথা

বলা হয়। আমার মনে হয় এনিয়ে এতো ভাবার দরকার নেই। এটা বাংলাদেশ ব্যাংক ভাববে। তবে যতোটা বলা হয় ততোটা খারাপ অবস্থায় নেই বাংলাদেশ। এটা দুশ্চিন্তার বিষয় হলেও খুব বেশি আতঙ্কের বিষয় নয়। কারণ রিজার্ভ তো সব সময় লাগে না। এটা যখন লাগে তখন ব্যবহার করতে হয়। এটা ‘রেইনি ডেইজের’ বিষয়, ‘শাইনি ডেইজের’ বিষয় নয়। তবুও দুশ্চিন্তা তো কিছু হয়-ই। প্রতি মুহূর্তে রপ্তানি ও প্রবাসি আয় তো কম বেশি বিদেশ থেকে আসছে।তাই এটা নিয়ে অযথা প্যানিক সৃষ্টি করার কারণ নেই। অনেকে শ্রীলঙ্কার উদাহরণ টানেন, কিন্তু আমি বলবো বাংলাদেশ সেই অবস্থায় নেই। বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋনের পরিমান এখনও জিডিপির ২০ শতাংশের নীচেই। বছরে এখন দুই বিলিয়ন ডলারের মতো এই ঋণের কিস্তি ও সুদ করতে হয়।আর এর মধ্যে প্রাইভেট খাতের বিদেশি ঋণ বাবদ রয়েছে জিডিপির ৩ থেকে ৪ শতাংশ। সবমিলে জিডিপির ২০ শতাংশের মতো। এই অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে এটি সবচেয়ে কম। সুতরাং এটা নিয়ে এখনি এতোটা দুশ্চিন্তা করবার কারণ নেই।

আমাদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকলে বড় বিনিয়োগগুলোকে খুব সামনে নিয়ে যেতে পারব না, সেই সঙ্গে বাস্তবায়নও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই একধরণের স্যোশাল কন্ট্রাক্ট রাজনীতিতে হতেই হবে। আশা করছি সকল রাজনৈতিক অংশীজনই বাংলাদেশের ভালো চায়। তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। শান্তিপূর্ণ ক্ষমতার পালাবদল বা ক্ষমতার হস্তান্তর যাই বলি না কেন তা নির্বাচনের মাধ্যমেই হতে হবে।আর তা করা গেলেই অর্থনৈতিক রূপান্তর টেকসই করা সম্ভব।সবাই যেন নিশ্চিত পরিবেশে কাজ করতে পারেন সেই রকম একটি পরিবেশ তৈরি করা জরুরি।

মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার অনেক বড়। বাংলাদেশ ৪৭৫ বিলিয়ন ডলারের একটি অর্থনীতির দেশ, যা এখনি বিশ্বে ৩৫তম অর্থনীতি। হয়তো অচিরেই ২৫তম অর্থনীতি হয়ে যাবে। সেই অর্থনীতিতে বাজার হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই অর্থনীতির জন্য আমদানি করা পণ্যের দরকার হবে। তবে স্বদেশী শিল্পের ভূমিকা হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন।সেজন্যেও কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমাদের আমদানি করতেই হবে।সুতরাং সকলেই তো বাংলাদেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখবার চেষ্টা করবে। আমাদেরও বাজার খুঁজতে হয়। বর্তমানে পশ্চিমের অনেক জায়গায় আমাদের বাজার। মনে রাখতে হবে, আমরা কিন্তু অনেক দেশের চেয়ে গ্লোবালাইজড। তাই পশ্চিম ও পূর্বের সঙ্গে মিলে মিশেই আমাদের চলতে হবে। সেজন্য বাংলাদেশের প্রতি যেমন আগ্রহ আছে বাইরের দেশগুলোর, তেমনি আমাদেরও আগ্রহ আছে বাইরের দেশগুলোর প্রতি।

পশ্চিমানির্ভর তৈরি পোশাকখাত সহ সম্ভাবনাময় অন্যান্য খাত নিয়ে বৈশ্বিক সম্পর্ক উন্নয়নে আমাদের স্মার্ট ডিপ্লোমেসি গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমরা অযথা অপ্রাসঙ্গিক এমন কোন কথা যেন না বলি যাতে শুধু শুধু বিতর্ক সৃষ্টি হয়। কিংবা বাণিজ্যে প্রভাব পড়ে । তবে তাদেরও আমাদের খুব দরকার। কারণ একটি দেশে এতোগুলো বড় বড় ফ্যাক্টরি কিন্তু সব দেশে নেই। ইকোনমি অব স্কেল বলে একটা কথা আছে। সেই বিচারে আমাদের অবস্হান বেশ শক্ত। তাছাড়া আমাদের কারখানাগুলোর দ্রুত টেকসই কৌশল-নির্ভর রূপান্তর হচ্ছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশের ৩০০ বেশি ফ্যাক্টরি সবুজ হয়ে গেছে। সুতরাং পশ্চিমের যে গ্রাহক আছে, তাদের আমাদের তৈরি এই টেকসই পণ্য দরকার। কম দামে তারা আমাদের থেকে পণ্যগুলো পায়। এক জায়গা থেকে তারা তা সংগ্রহ করতে পারছে। এটা কিন্তু একটি নির্ভরতার পারস্পারিক সম্পর্ক। এ সম্পর্ক মোটেও ঠুনকো নয়।

আমার মনে হয়, আমাদের সবসময়ই চেষ্টা করা উচিত, রপ্তানি ও আমদানি ঠিকঠাক রাখবার জন্য যাদের সঙ্গে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করি; তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা। একটি স্মার্ট বিদেশনীতি এখন আমরা অনুসরণ করছি।এটি যেন আমরা অব্যাহত রাখি। সাম্প্রতিক দশকে আমরা কিছু ভূ- রাজনৈতিক বাস্তবতারও মুখোমুখি হয়েছি। তবুও আমাদের বাণিজ্যিক জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছি। তবে হালে পরিস্থিতির দ্রুত বদল হচ্ছে। আমরা কি জানতাম রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মাঝে হঠাৎ করে হামাস ইসরায়েলে আক্রমণ করবে? তারপর ইসরায়েল গাজায় এমন অমানবিক হামলা চালাবে? এই ঘটনার পর এর প্রভাব বিশ্বরাজনীতিতে পড়ছে। এর প্রভাব অর্থনীতিতেও পড়বে ।এটাই স্বাভাবিক। তাই আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে। আত্মতুষ্টিতে ভোগার কোন কারণ নেই। সর্বক্ষণ আমাদের বাণিজ্যিক অংশিজনদের সাথে এনগেজ থাকতে হবে। ‘সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব-কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়’ বঙ্গবন্ধুর এই পররাষ্ট্র নীতি সবাইকে মনে করিয়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে বৈরিতা আসলেই আমাদের জন্য ঝুঁকি তৈরি করবে। আমরা কারো সঙ্গে বৈরিতা করব না, সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখব, এটা যেন মনোযোগ দিয়ে আমরা পালন করি। যারা পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে কাজ করেন তারা যেন খুব স্মার্টলি এই কথা গুলো মনে রাখেন। তবে আমাদের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থ যেন এই নীতিকৌশলের মধ্যমনি হিসেবে থাকে।এখন অব্দি আমরা এই কৌশলটি ধরে রাখতে পেরেছি।

জাতীয় নির্বাচন খুবই সন্নিকটে। আমাদের দেশের বাস্তবতার আলোকেই দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহার তৈরি হবে। এখনো যে অবস্থা আমাদের

দেশের তাতে মনেকরি যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নটাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। এখানে কৃষি, রপ্তানি শিল্প, ডিজিটাল পণ্য, বিশেষ করে স্কিল ডেভেলপমেন্ট, অর্থাৎ শিক্ষা ও সবার জন্য স্বাস্থ্য; সেই সঙ্গে সবার জন্য স্বাস্থ্য বীমা ইশতেহারে প্রধান্য পাওয়া উচিত। এখন প্রায়শঃই ক্যানসার-হৃদরোগ হচ্ছে, আকষ্মিকভাবে অনেক টাকা প্রয়োজন হয়, তাই সার্বজনীন স্বাস্থ্যবীমা চালু করা খুবই জরুরি।

আশা করব, এই বিষয়টি যেন সব দলের অগ্রাধিকারে থাকে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে আরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বিশেষ করে স্কিল ডেভেলপমেন্ট খুব জরুরি। অন্যদিকে, জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলায় অভিযোজনের দিকে জোর দিতে হবে। আন্তর্জাতিকভাবেও আমাদের অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। কম সুদের যে ঋণ আমরা পাব সেগুলো নেব আমরা। এই সব বিষয়গুলো একসঙ্গে মিলে একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশলের ওপর জোর দিতে হবে।

বিশ্বব্যবস্থার দ্রুত বদল হচ্ছে। যেসব দেশে দ্রুত পুঁজিবাদী উন্নয়ন ঘটছে সেখানে মূল্যবোধের অভাব ঘটছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৪০ লক্ষ পরিবার এখন ‘একক পরিবার’। পারিবারিক বন্ধন ভেঙে যাচ্ছে। সেই প্রভাব আমাদের দেশেও পড়তে শুরু করেছে। ডিভোর্স বাড়ছে আমাদের এখানে। অর্থনৈতিক বৈষম্য তীব্র হচ্ছে। এর প্রভাব সমাজেও পড়ছে। আগে যে সামাজিক ভাবে এক রাজনৈতিক দলের পরিবারের সঙ্গে ভিন্ন মতাদর্শের রাজনৈতিক দলের পরিবারে বিবাহ হতো। আজকাল সেই বাস্তবতা আর নেই। অবশ্য এর পেছনে আদর্শিক কারণও রয়েছে। তবু বলবো সমাজে মিলেমিশে থাকার এই যে মূল্যবোধ, এটা অনেকটাই কমে গেছে। সামাজিক পুঁজির বড়ো ধরণের ক্ষয় হয়েই চলেছে।

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের প্রধান মূল্যবোধের কেন্দ্রবিন্দু। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আসলে কি? মুক্তিযুদ্ধে চেতনা বলতে আমরা বুঝি, উদারনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষ, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ-নির্ভর অংশগ্রহণমূলক একটি সমাজ; যে সমাজে ভালো মানুষদের ঠাঁই হবে। আজকের দিনে হয়তো মুক্তিযুদ্ধের কথা বলি আমরা কিন্তু যারা নিঃস্ব, যারা প্রান্তিক তাদের ঠেলে দূরে পাঠিয়ে দিই। সবই কথার কথা। অথচ মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ হতে হবে সবার, অন্তর্ভূক্তিমূলক। প্রান্তজনদের জায়গা আরও বেশি করে দিতে হবে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে। গত দেড় দশকে এই লক্ষ্যে অনেকটা পথ নিশ্চয় হেঁটেছি। তবে আরও অনেক পথ আমাদের হাঁটা এখনও বাকি। আমরা যেন সেই লক্ষ্য পূরণে দ্বিধান্বিত না হই।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর।

গাজায় মহাদুর্যোগে ফিলিস্তিনিদের পাশে বাংলাদেশ

মিসরের সুয়েজ খাল পেরিয়ে ১৯৭৩-এর আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত সিনাই রণাঙ্গনে এসে পৌঁছলাম। ২০১০-এর জুনের সকালে। সিনাই মরুভূমির মধ্য দিয়ে তৈরি সড়ক পথে প্রায় ৫০ কিলোমিটার যাওয়ার পর স্থানীয় ট্যাক্সিচালক আহমদ জানালেন, ‘আরও প্রায় ১৫০ কিলোমিটার গেলেই সিনাইয়ের রাফা ক্রসিং।’ সেটিই মিসর-গাজার (ফিলিস্তিন) সীমান্ত। গাজা সীমান্ত ইঙ্গিত করে দীর্ঘদেহী আহমদ আরও বললেন, ‘ছোটবেলায় পরিবারের সঙ্গে শরণার্থী হিসেবে মিসরে এসেছিলাম। গাজা আমার জন্মভূমি’। আমাদের থেকে মাত্র ১৫০ কিলোমিটার দূরে থাকা প্যালেস্টাইন বা ফিলিস্তিনের সুপ্রাচীন জনপদ গাজা এখন বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত জনপদ। যা ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বর আক্রমণে পরিণত হয়েছে ভয়াল মৃত্যুপুরীতে। ইসরায়েলি বাহিনীর আক্রমণে আহমদের মতো হতভাগ্য প্রায় ২৩ লাখ ফিলিস্তিনির জনপদ গাজায় এখন কেয়ামতের মতো দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। মিডিয়ায় দৃশ্যমান, এমন ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যা সাম্প্রতিককালে বিরল। ইতোমধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত গাজায় প্রায় ৬ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। গাজার এই মহাদুর্যোগে, মজলুম ও বিপন্ন ফিলিস্তিনিদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজার হামাস যোদ্ধারা ইসরায়েলের অত্যাধুনিক সামরিক বাহিনীর কার্যকর নজরদারি প্রযুক্তি এবং চৌকশ ও দুর্র্ধর্ষ গোয়েন্দা বাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে গাজা সীমান্ত অতিক্রম করে ইসরায়েলের ভিতরে আক্রমণ করে। তাদের হামলায় ২৯৯ জন সামরিক বাহিনীর সদস্যসহ নিহত হয় প্রায় ১৪০০ ইসরায়েলি নাগরিক। হামাসের এই আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলি বাহিনীর আক্রমণে মাত্র ৩৬৫ বর্গকিলোমিটার আয়তনের গাজা স্ট্রিপ নামের ক্ষুদ্র উপকূলীয় ছিটমহলটি এখন ধ্বংসস্তূপ। এই বর্বর আক্রমণে সেখানে শুরু

হয়েছে দ্বিতীয় নাকবা বা মহাদুর্যোগ। বৃষ্টির মতো বোমা পড়ছে হাসপাতাল, ঘরবাড়ি, স্কুল-মসজিদে। বিশেষত গাজার আল-আহালি আল-আরাবি হাসপাতালের হত্যাযজ্ঞ স্তম্ভিত করেছে বিশ্বকে। গাজার মানুষকে ‘কালেকটিভ পানিশমেন্ট’ দেওয়ার জন্য খাদ্য, বিদ্যুৎ, পানি, জ্বালানি বন্ধ করে দিয়ে গাজাকে নয়া কারবালা বানিয়েছে ইসরায়েল। প্রায় ১১ লাখ ফিলিস্তিনিকে উত্তর গাজা থেকে দক্ষিণ গাজায় যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় পলায়মান মানুষের ওপর বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। ইসরায়েলের এই জঘন্য গণহত্যা মধ্যপ্রাচ্যে নতুন সংকটের জন্ম দিয়েছে। গাজা উপত্যকা নিয়ে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পরিকল্পনাকে নাৎসিদের ইহুদি নিধনের সঙ্গে তুলনা করেছেন ইসরায়েলি সংসদ সদস্য ওফার ক্যাসিফ। প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যৎ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ কথা (১৯৩০)। আশ্চর্য বিষয় হলো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩০ সালে অর্থাৎ ৯৩ বছর আগে প্যালেস্টাইন অঞ্চলে অস্থিরতা ও অশান্তির আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। জুইশ স্ট্যান্ডার্ড নামে যুক্তরাষ্ট্রের একটি পত্রিকা থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক সাক্ষাৎকার যখন বের হয়, তখন (১৯৩০) প্যালেস্টাইনে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে অস্থিরতা চলছে। তখনো ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠিত হয়নি।

সেই সময়ে ইউরোপ-যুক্তরাষ্ট্র থেকে দলে দলে আসা ইহুদি জনগোষ্ঠী ফিলিস্তিনের আরব সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে বসবাস স্থাপন করছিল। ইহুদিরা দরিদ্র আরব সম্প্রদায় থেকে কৌশলে জমি কিনছিল। অন্যদিকে সেই সময় শক্তিশালী কিছু দেশের সমর্থনে গোপনে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা চলছিল। সেই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘জায়নবাদী নেতৃত্বে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে আরবদের থেকে আলাদা করার জন্য জোর দিলে পবিত্র ভূমিতে বিস্ফোরণ ঘটবে।’ প্যালেস্টাইন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ও ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টি সত্যি বিস্ময়কর। বিষয়টি হয়তো এখনো প্রাসঙ্গিক।
ফিলিস্তিনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ঐতিহাসিক। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ফিলিস্তিন ও বাংলাদেশের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং আন্তরিক। ‘দুই রাষ্ট্র সমাধানের’ ভিত্তিতে বাংলাদেশ সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র সমর্থন করে এবং ইসরায়েলের ‘অবৈধভাবে ফিলিস্তিন দখলের’ সমাপ্তি দাবি করে থাকে।

প্রায় সাড়ে ৫ হাজার কিলোমিটার দূরের ফিলিস্তিনের প্রতি অব্যাহত সমর্থন জানিয়ে আসছে বাংলাদেশ। ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন জানানোর

অংশ হিসেবে বাংলাদেশ গত ৫২ বছরে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়নি। ১৯৭১-এর পরে প্রথমদিকে অধিকাংশ আরব রাষ্ট্র সদ্যস্বাধীন হওয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, কিন্তু এই সম্পর্ক উষ্ণ হতে থাকে যখন ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে আরবদের সমর্থন করে মেডিকেল টিম ও ত্রাণ সহায়তা পাঠিয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সহায়তা করে।

১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের লাহোরে ওআইসির দ্বিতীয় সম্মেলনের সময় ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাত ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বৈঠকের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে প্রথম উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকায় প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের (পিএলও) কার্যালয় স্থাপনের অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও পিএলওর মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। ইসরায়েলের দখলদারির অবসান ঘটিয়ে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা অর্জনকে সমর্থন করা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। ১৯৬৭ সালে নির্ধারিত সীমানা অনুযায়ী জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনের রাজধানী হিসেবে সমর্থন করে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের চতুর্থ ন্যাম সম্মেলনে ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে তাঁর প্রথম ভাষণে এবং ১৯৭৪ সালে ওআইসির দ্বিতীয় সম্মেলনে ফিলিস্তিনি জনগণের সংগ্রাম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। বাংলাদেশে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসেফ এস ওয়াই রামাদান বলেছেন, ফিলিস্তিনের প্রতি বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের যে আন্তরিকতা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা, তা বিশ্বে বিরল। ফিলিস্তিনের সঙ্গে বাংলাদেশের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কেবল ধর্মের ভিত্তিতে নয়। এর সঙ্গে রয়েছে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত একটি জাতির জন্য বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের আবেগ, মমত্ববোধ ও মানবতা। ফিলিস্তিনের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের অসাধারণ আন্তরিক সমর্থন রয়েছে। ইয়াসির আরাফাত বেশ কয়েকবার বাংলাদেশ সফরে আসেন। প্রতিবারই তিনি বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম, রাজনীতিবিদ ও সাধারণ জনগণের থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা পান। ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ২০১৭ সালে বাংলাদেশ সফর করেন।

১৯৮৮ সালের ১৫ নভেম্বর ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ঘোষণার পর থেকে জাতিসংঘের যে ১৩৮টি দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে বাংলাদেশ তার অন্যতম। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ একটি স্মারক ডাকটিকিট উন্মোচন করে যেখানে একজন ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাকে দেখা যায়, যার পেছনে রয়েছে কাঁটাতারে ঘেরা আল-আকসা মসজিদ। সিরিয়ার রণাঙ্গনে

বাংলাদেশ মেডিকেল টিম (১৯৭৩)। ইসরায়েল অধিকৃত ভূমি উদ্ধারের জন্য ১৯৭৩ সালে মিসর ও সিরিয়া যৌথভাবে ৬ অক্টোবর ১৯৭৩ তারিখে ইসরায়েল আক্রমণ করে, যা ইতিহাসে ‘আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ অক্টোবর ১৯৭৩’ নামে খ্যাত।

মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার অধিকাংশ আরব দেশ তখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। এ সময় এক বিস্ময়কর কূটনৈতিক অভিযানে অবতীর্ণ হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আরবদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে ঘোষণা করলেন, ‘আরবরা আমাদের স্বীকৃতি দিক না দিক, তারা আমাদের ভাই। তাদের ন্যায্য সংগ্রামে আমরা তাদের পাশে আছি।’ এই পটভূমিতেই সিরিয়ার রণাঙ্গনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি মেডিকেল টিম ও মিসরের বাহিনীর জন্য চা পাঠানো হয়েছিল। কর্নেল খুরশিদ উদ্দিন আহমেদের (পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, প্রয়াত) নেতৃত্বে ২৮ সদস্যের একটি মেডিকেল টিম ১৯৭৩-এর ১৯ অক্টোবর সিরিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়। সৈন্যবাহী বিমানটির যাত্রাবিরতি হলো বাহরাইনে। এরপর বিমানটি তুরস্ক-গ্রিস মাল্টার আকাশ হয়ে অবশেষে সন্ধ্যায় ল্যান্ড করল লিবিয়ার বেনগাজি বিমানবন্দরে। বেনগাজিতে মিসরের প্রতিনিধির কাছে মিসরীয় বাহিনীর জন্য বাংলাদেশের চায়ের প্যাকেটগুলো হস্তান্তর করা হলো। ২১ অক্টোবর, লিবিয়া সরকারের বন্দোবস্তে বাংলাদেশের সেনাদল মিডল ইস্ট এয়ারলাইনসের একটি বিমানে লেবাননের রাজধানী বৈরুতে পৌঁছে। বৈরুত থেকে সড়কপথে ২২ অক্টোবর ভোররাতে দামেস্ক নগরীতে পৌঁছায় মেডিকেল টিম। বাংলাদেশের মেডিকেল টিমটি দামেস্ক নগরীর পশ্চিমদিকে দারুস সালাম নামক স্থানে মোতায়েন করা হয়। সেখানে মেয়েদের একটি স্কুলে ইতিপূর্বে সিরিয়ার চিকিৎসকরা একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ওই চিকিৎসা কেন্দ্রটিকে বাংলার মেডিকেল দল একটি ক্ষুদ্র তবে কার্যকর ফিল্ড হাসপাতালে পরিণত করে। ওই হাসপাতালে মূলত সিরিয়ার আধাসরকারি বাহিনী ও প্যালেস্টাইনি যোদ্ধাদের চিকিৎসা দেওয়া হতো।

বাংলাদেশের সেনা দল ২২ নভেম্বর পর্যন্ত (৩০ দিন) দামেস্কে দায়িত্ব পালন করে। মেডিকেল টিমটি এক মাসে ওয়ার সার্জারিসহ শতাধিক ব্যক্তির চিকিৎসা প্রদান করে। মেডিকেল টিমের সদস্যরা তাদের পেশাগত দক্ষতা, দেশপ্রেম, আন্তরিকতা ও মমত্ব সহকারে অসুস্থ ও আহত আরবদের সেবা প্রদান করেছিল। ৩০ দিনের এই মেডিকেল মিশনটি ছিল ঘটনাবহুল ও নাটকীয়তায় ভরা। এর তাৎপর্যও ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। ১৯৭৩-এর আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু সরকার

আরব ভাইদের মুক্তিসংগ্রামে সহায়তার জন্য একদল মুক্তিযোদ্ধা পাঠানোর ঘোষণা দেন। সে ঘোষণায় অনুপ্রাণিত হয় দেশের অনেক মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার লে. কর্নেল এম এ তাহের, বীরউত্তম, সেখানে যুদ্ধে যোগ দিতে চেয়ে বঙ্গবন্ধুকে ১৩ অক্টোবর ১৯৭৩ তারিখে একটি চিঠি লিখেছিলেন। উল্লেখ্য, অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল তাহের তখন বিআইডব্লিউটিসির ‘সি-ট্রাক ইউনিটের’ ম্যানেজার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

লেবাননে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেডিকেল টিম (১৯৮১)। ইসরায়েল বাহিনী ১৯৮১ সালে লেবাননে অবস্থিত ফিলিস্তিন শরণার্থীদের ওপর ব্যাপক আক্রমণ পরিচালনা করেছিল। আক্রমণে হতাহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানায়। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ সরকার লেবাননে ফিলিস্তিনি নাগরিকদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি মেডিকেল টিম লেবাননে পাঠায়। তৎকালীন লে. কর্নেল এইচ কে এম গোলাম মুরতোজার (পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল) নেতৃত্বে ৬ সদস্যের এই মেডিকেল টিম ১৯৮১ সালের ২৩ আগস্ট লেবাননে যায়। দায়িত্ব পালন শেষে দলটি ১৯৮১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে। মেডিকেল টিমটি দক্ষিণ লেবাননের সিডনে অবস্থিত সাইদা হাসপাতালে আহত ফিলিস্তিনিদের চিকিৎসা প্রদান করে। সিডন ছাড়াও এই মেডিকেল টিম ফিলিস্তিন রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি পরিচালিত কয়েকটি হাসপাতালে যায়। লেবাননে ফিলিস্তিনির পক্ষে বাংলাদেশিদের যুদ্ধ (১৯৮০-১৯৮২)। ইয়াসির আরাফাত যখন ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি স্বাধীন আবাসভূমি গড়ার সংগ্রামে লিপ্ত তখন সেই সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন অনেক বাংলাদেশি তরুণ। ১৯৮০-৮২ সালে লেবাননে অবস্থান নিয়ে স্বাধীন ফিলিস্তিনের পক্ষে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল কয়েক শ মতান্তরে কয়েক হাজার বাংলদেশি তরুণ। ১৯৭০-১৯৮০ দশকে লেবাননে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের (পিএলও) সদর দফতরসহ (বৈরুতে) শক্তিশালী অবস্থান ছিল। ১৯৮২-এর জুনে ইসরায়েল লেবাননে আগ্রাসন পরিচালনা করলে ফিলিস্তিনি গেরিলাদের সঙ্গে প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধারা লেবাননে প্যালেস্টানিদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। চরম গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের সঙ্গে অস্ত্র হাতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করা থেকে শুরু করে অস্ত্র-রসদ বহন ও পাহারার কাজও করেছেন বাংলাদেশের এসব তরুণ স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধা। জানা যায়, লেবাননের প্রায় শতাধিক বাংলাদেশি যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রায় ৮ হাজার বাংলাদেশি অংশ নিয়েছেন। উল্লেখ্য, লেবাননের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের বড় অংশ ছিল বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সদস্য। বিশেষত তারুণ্যনির্ভর একটি বামপন্থি দলের। ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধে লেবাননে সম্মুখ সারির গেরিলা ছিলেন নরসিংদীর আতাউর রহমান ফারুক। তিনি নিজের যুদ্ধ-অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চকর ঘটনা নিয়ে ‘ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধের গেরিলা আমি’-নামে একটি বই লিখেছেন।

লেবাননের যুদ্ধে বাংলাদেশি যোদ্ধাদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক আছে। পিএলও লেবানন শাখার সূত্রমতে, বাংলাদেশি যোদ্ধাদের সংখ্যা ১ থেকে দেড় হাজার হতে পারে (দৈনিক আল-আখবার)। সাম্প্রতিক ঘটনা ও বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া। ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশ তার সৃষ্টির সময় থেকেই ফিলিস্তিনের নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের পাশে আছে এবং তাদের সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। ইসরায়েলের চলমান নৃশংস মানবতাবিরোধী এই হামলায় নারী, শিশু ও সাধারণ ফিলিস্তিনিরা মারা যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। বর্তমান ক্ষমতাসীন দলসহ প্রায় সব রাজনৈতিক দল গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে।

সাম্প্রতিক গাজাবাসীর ওপর ইসরায়েলের নির্লজ্জ হামলার নিন্দা জানিয়ে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসকে চিঠি পাঠিয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে তিনি ফিলিস্তিনের প্রতি বাংলাদেশ ও এর জনগণের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ সব সময় ফিলিস্তিনের পাশে আছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত ১৮ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনে ওআইসিভুক্ত ১৪ দেশের রাষ্ট্রদূত সাক্ষাৎ করতে এলে এসব কথা বলেন তিনি। ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ রামাদানের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ সব সময় ফিলিস্তিনের পক্ষে আছে। ২০ অক্টোবর শুক্রবার বাংলাদেশের সব মসজিদে ফিলিস্তিনিদের জন্য দোয়া পড়ানো হয়। ২১ অক্টোবর গাজার নিহত ফিলিস্তিনিদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক প্রকাশ করা হয়েছে। ২২ অক্টোবর ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় নিহত ফিলিস্তিনিদের জন্য জাতীয় সংসদে শোক জানানো হয়। গাজা উপত্যকার যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষের জন্য মানবিক সহায়তা চালানের প্রথম কিস্তি ২৩ অক্টোবর বিকালে ঢাকায় ফিলিস্তিন রাষ্ট্রদূতের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যুদ্ধ বন্ধ করা।

বিপন্ন ফিলিস্তিনিদের জীবন রক্ষা করা। যুদ্ধবিরতির কথা বারবার বলছে বাংলাদেশ। ইসরায়েলের এই বর্বর আক্রমণ বন্ধ করতে এগিয়ে আসুক আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, গবেষক।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ ছাড়া বিএনপি এখন কী করবে?

রাজনৈতিক সংকট দূর করতে বিএনপি মাঝে মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের কথা বললেও বরাবরই তার আগে একটি শর্ত জুড়ে দিয়ে আসছে। তাদের দাবি- নির্বাচনকালীন সরকারের দাবি আওয়ামী লীগকে আগে মেনে নিতে হবে, তবেই সংলাপ হবে। না হলে রাজপথের আন্দোলনের মাধ্যমেই তারা ফয়সালা করার হুঁশিয়ার বারবার দিয়েছে। তবে এদফা আর আগ বাড়িয়ে সংলাপের চিন্তা করছে না আওয়ামী লীগ। বিএনপি যদি কোনো শর্ত ছাড়া সংলাপ করতে চায়, আওয়ামী লীগ তখন ‘ভেবে দেখবে’ বলে জানিয়েছে ক্ষমতাসীন দলটি।

দুই রাজনৈতিক দলের এমন অবস্থানের মধ্যে ২৮ অক্টোবর ঢাকার মহাসমাবেশ করে বিএনপি। শান্তিপূর্ণ সমাবেশের কথা বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হলেও রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে সহিংসতা হয়। সংঘাত সহিংসতায় একজন পুলিশ সদস্যসহ দুজন মারা যায়। সহিংসতার ঘটনায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ বহু নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আত্মগোপনে আছেন দলটির অনেক শীর্ষ নেতা। এরপরও সরকারের পদত্যাগের দাবিতে তিনদিনের অবরোধ দিয়েছে বিএনপি। অনেকে রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলেছেন- যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সাথে বিএনপি ও জামায়াতের নেতাদের একাধিক বৈঠকের পর নিজের শক্তিশালী ভেবেছিল বিএনপি। এজন্য রাজপথে সহিংস কর্মসূচির দিকে এগিয়েছে দলটি, পদদলীত করেছে সরকারের সাথে শর্তহীন সংলাপের পথটিও।

তবে নির্বাচন কমিশনের সাথে মঙ্গলবার বৈঠক শেষে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস সংকট নিরসনে

রাজনৈতিক দলগুলো শর্তহীনভাবে সংলাপে বসবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করা- রাজনৈতিক দল, সরকার, ভোটার, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম এবং অবশ্যই নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। যেকোনো পক্ষের রাজনৈতিক সহিংসতা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে কোনো স্থান নেই। আমি আশার করি সব পক্ষ শর্তহীনভাবে সংলাপে বসে সামনে দিকে এগুবে এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পথ খুঁজে নেবে।’

স্বভাবতই এখন প্রশ্ন উঠেছে- এতো দিন যে দলটি শর্তহীন সংলাপ বসতে চায়নি, সেই দলটি পিটার হাসের কথায় সংলাপে বসবে? আর কেনই বা পিটার হাস নির্বাচন কমিশনে গিয়ে বৈঠক করলেন, আর শর্তহীন সংলাপের কথা বললেন। ২৮ অক্টোবর সহিংসতার পর কার্যত নিশ্চুপ ছিল মার্কিন দূতাবাস। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কথিত উপদেষ্টার পরিচয় দিয়ে বিএনপির মিথ্যাচার নিয়েও টু শব্দ পর্যন্ত করেননি পিটার হাস। সেই তিনি মঙ্গলবার ছুটে গেলেন নির্বাচন কমিশনে। আশা করলেন- সংকট নিরসনে রাজনৈতিক দলগুলো শর্তহীন সংলাপে বসবেন। এরআগে বাংলাদেশে একটি বিশ্বাসযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক ও সহিংসতামুক্ত জাতীয় নির্বাচন নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক দলগুলোকে অর্থবহ সংলাপে বসার পরামর্শ দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল। কিন্তু বিএনপি শর্তহীন সংলাপকে বারবার ‘না’ বলেছে। সেই বিএনপি কী এখন পিটার হাসের কথায় এখন সরকারের সাথে সংলাপে বসবে?

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ না হওয়ার জন্য আওয়ামী লীগকে বারবার দায়ী করে আসছে বিএনপি। দলটির যুগ্ম মহাসচিব মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বিবিসি বাংলাকে বলছেন, ‘তিন মেয়াদে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ নমনীয় হলেই সমঝোতার পরিবেশ তৈরির পথ উন্মুক্ত হতে পারে। আওয়ামী লীগ বড় রাজনৈতিক দল। তারা তিন মেয়াদে ক্ষমতায়। তাই তাদের নমনীয় হওয়াটাই প্রত্যাশা করে সবাই।’ অর্থাৎ সংলাপ বা সমঝোতার জন্য বিএনপির দিকে থেকেও বড় শর্ত আছে এবং তা হলো আলোচনায় বসার আগেই আওয়ামী লীগকে বিএনপির প্রধান দাবিটি মানা হবে- এমন নিশ্চয়তা দিতে হবে।

বিএনপি যদি কোনো শর্ত ছাড়া সংলাপ করতে চায়, আওয়ামী লীগ তখন ‘ভেবে দেখবে’ বলে জানিয়েছিলেন ক্ষমতাসীন দলটির সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। গত ১২ অক্টোবর সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন, “সংলাপের চিন্তা আমরা করব তখন যখন তারা (বিএনপি) এই চারটি শর্ত যদি তারা প্রত্যাহার করে নেয়। শর্তযুক্ত কোনো সংলাপের ব্যাপারে আমাদের

কোনো চিন্তাভাবনা নেই। শর্ত তারা প্রত্যাহার করলে তখন দেখা যাবে।” অর্থাৎ সংলাপ হতে পারে, তবে সেটি হতে হবে শর্তহীন। দাবি নেমে নেয়ার পর আলোচনা এটা কখনো হতে পারেনা।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংকট দূর করার জন্য সংলাপ হয় ১৯৯৪ সালে। ২০০৬ সালে আওয়ামী লীগ-বিএনপি মহাসচিব পর্যায়ের সংলাপহয়। ২০১৩ সালে আওয়ামী লীগের সাথে সংলাপ হয়। সর্বশেষ ২০১৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিএনপির নেতৃত্বে গঠিত ঐক্যফ্রন্টের সংলাপ হয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাথে। সবগুলোই সংলাপ হয়েছে শর্তহীন ভাবে।

বিএনপির বর্তমান অবস্থা বাংলা প্রবাদের মতো ”সাধলে জামাই খান না, না-সাধলে জামাই পান না”। এতো দিন শর্ত মানলে তবেই সংলাপে বসতে চেয়েছিল বিএনপি। আর তখন আওয়ামী লীগ বলেছিলন- “শর্ত দিয়ে সংলাপ হয়না।” তবে মঙ্গলবার পিটার হাস- সংকট নিরসনে রাজনৈতিক দলগুলো শর্তহীনভাবে সংলাপে বসবে বলে আশা প্রকাশ করেন। কিন্তু আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের সেই আশায় ”গুড়ে বালি” দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বেলজিয়াম সফর নিয়ে মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রশ্নোত্তর পর্বে ইটিভির হেড অব নিউজ রাশেদ চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চান- মঙ্গলবার পিটার হাস নির্বাচন কমিশনে গিয়ে রাজনৈতিক সংকট সমাধানে শর্তহীন সংলাপের কথা বলেছেন সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী কী বলতে চান। এসময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘খুনিদের সঙ্গে কিসের সংলাপ? বরং সে (পিটার হাস) বসে ডিনার খাক, সে সংলাপ করুক। আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। এটা বাংলাদেশের মানুষও চাইবে না। বাংলাদেশের মানুষ বিএনপি জামাতকে ঘৃনা করে। যেটুকু সুযোগ পেয়েছিলো, আমরা করে দিয়েছিলাম সুযোগ সেটাও হারিয়েছে। যখন উপ-নির্বাচনে হিরো আলমকে কেউ মেরেছিলো তার বিচার দাবি করেছিলো। এখন যখন পুলিশকে পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হলো তখন কেনো বিচারের দাবি করে না। যারা সাংবাদিকদের সুরক্ষার কথা বলে। আজকে যখন এতো সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হলো তারা চুপ কেনো?’

প্রধানমন্ত্রীর কথায় পরিস্কার বিএনপির সাথে কোনো সংলাপে বসবে না বর্তমান সরকার। সেটি শর্তহীন হোক বা শর্তযুক্ত হোক। সেই সাথে যুক্তরাষ্টের রাষ্ট্রদূতকে এক হাত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, “ট্রাম্প সাহেবের সঙ্গে বাইডেন সংলাপ করছে? ট্রাম্প

বাইডেনের সংলাপের দিন আমরাও সংলাপ করবো।” ২৮ অক্টোবর সহিংসতার পর বিএনপির এখন “আমও গেল ছালাও গেল”। নির্বাচনে অংশগ্রহণ ছাড়া বিএনপির সামনে আর কী কোন পথ খোলা আছে? সেই প্রশ্নের উত্তর জানতে অপেক্ষা করতে হবে নভেম্বর পর্যন্ত।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।